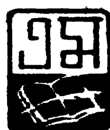
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

নারায়ণ চৌধুরী



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীনিভা মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট : শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর
শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-১৪

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

'কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র' পুস্তকের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে চতুষ্কোণ, চেতনিক, রক্তস্বাক্ষর, শিক্ষক, শিক্ষা ও সভ্যতা, সাহিত্য-প্রয়াসীর শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা প্রভৃতি সাময়িক পত্র ও সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে অমর কথাকারের প্রতি লেখকের যৎসামান্য শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপে সেগুলি একত্রিত করে প্রকাশ করা হলো।

পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই এমন দু' একটি নতুন প্রবন্ধও সংযোজিত হয়েছে।

গ্রন্থের ভাল মন্দ বিচারের কর্তা পাঠক, সে বিষয়ে লেখকের কিছু বলার থাকতে পারে না। তবে এইমাত্র বলা যেতে পারে যে, শরৎ-সমীক্ষায় এযাবৎ অপ্রযুক্ত একটি নূতন দৃষ্টিকোণের মানদণ্ডে লেখক শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়নে অগ্রসর হয়েছেন। ওই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রাহ্য হওয়া না হওয়ার ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়ে লেখক নিশ্চিন্ত।

এই বইয়ের প্রকাশে যাঁরা নানাভাবে আনুকূল্য করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

গ্রন্থকার

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

সঙ্গীত পরিক্রমা

আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন

সমকালীন সাহিত্য

সাহিত্য ও সমাজ মানস

কথাসাহিত্য

গান্ধীজি

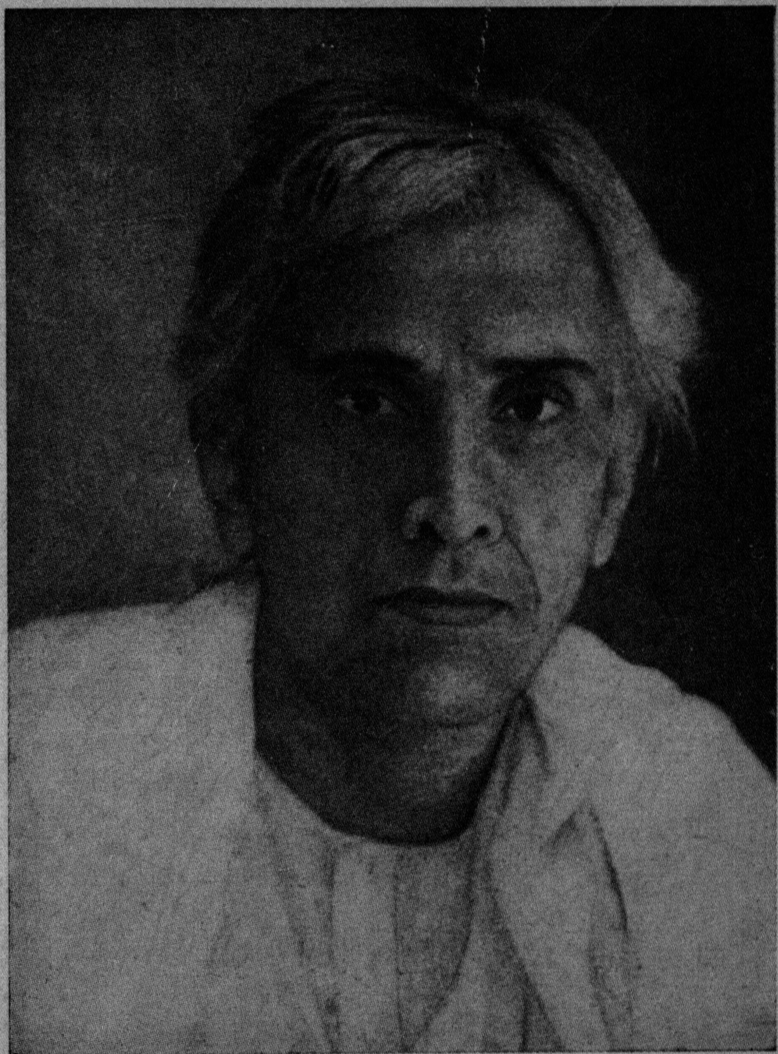
আত্মদর্শন

অম্লমধুর

Maharshi Devendranath Tagore

প্রভৃতি

সূচী



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম—১৮৭৬ খ্রীঃ মৃত্যু—১৯৩৮ খ্রীঃ

॥ ১ ॥

উপক্রমণিকা—শরৎ সাহিত্যের নবমূল্যায়ণ

(অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এক আশ্চর্য প্রতিভা।) এই প্রতিভার কোন দোসর খুঁজে পাওয়া যায় না বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আগে ও পরে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই শরৎচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বহুবিস্তারী প্রতিভাসম্পন্ন লেখক, তাঁরা দু'জন রসসৃষ্টিতে যেমন অনন্য তেমনি মনীষা ও বৈদগ্ধ্যের ক্ষেত্রে বিচিত্রপথসন্ধানী জিজ্ঞাসায় ভরপুর; পক্ষান্তরে শরৎচন্দ্রের পর কথাসাহিত্যে কেউ কেউ এসেছেন যাঁরা শরৎচন্দ্রের তুল্য প্রতিভার অধিকারী না হলেও বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে সম্প্রসারিত করেছেন। যেমন বিভূতিভূষণ বাংলা উপন্যাসে একটি নূতন আয়তন যোগ করেছেন—প্রকৃতিপ্রেম; তারাশঙ্কর রকমারি চরিত্রের স্রষ্টা; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সমাজ-স্থিতির সবচেয়ে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক লেখক ও বাস্তবতার সর্বাগ্রগণ্য শিল্পী। কিন্তু যেখানে শরৎচন্দ্র তুলনারহিত এবং পূর্বপর সকল দৃষ্টান্তের ঊর্ধ্বে স্থিত, সে হলো কথাসাহিত্যের মনোহারিত্বের ক্ষেত্র। এমন মনোহারী ও লোকপ্রিয় গল্প-উপন্যাস আর কেউ সৃষ্টি করে যেতে পারেননি বাংলা ভাষায়। শরৎচন্দ্রকে বাংলার পাঠক সম্প্রদায় 'অপরাজেয়' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। অভিধাটি অকারণ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অপরিসীম সৃষ্টিকুশলতার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছেন; কিন্তু কথাসাহিত্যের সীমিত ক্ষেত্রে এলে দেখতে পাই, শরৎচন্দ্র তাঁর লেখার জাদুতে বাংলার পাঠকচিত্তকে যেরূপ গভীরভাবে সম্মোহিত করেছেন এমন ওই দুই অগ্রগামী ও দিক্‌পাল লেখকের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। মনোজ্ঞতার শিল্পে শরৎচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

মনোজ্ঞতা তথা লোকপ্রিয়তার শিল্পকে স্বভাবতঃই নিম্নস্তরের শিল্প জ্ঞান করার একটা সহজ প্রবণতা আমাদের সকলেরই মধ্যে কম-বেশী রয়েছে। বিশেষ বিশেষ লেখকের বেলায় এ কথা সত্য হতে পারে কিন্তু শরৎচন্দ্রের বেলায় এ কথা আদৌ সত্য নয়। লোকপ্রিয়তার নজিরে শরৎচন্দ্রকে খাটো করে দেখবার উপায় নেই, কেননা শরৎচন্দ্র নিছক লোকপ্রিয় শিল্পীই নন;

আরও অনেক কিছু। তাঁর সে সব বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধেই আমরা কতক পরিমাণে করবার চেষ্টা করবো, তবে গোড়াতেই যে-কথাটা বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়া দরকার তা হলো তাঁর মত জনপ্রিয় শিল্পী আজ পর্যন্ত বাংলার কথাসাহিত্যের আসরে দ্বিতীয় আবির্ভূত হয়নি। বাংলার পাঠকপাঠিকার হৃদয়াসনে সুদৃঢ় অধিকার স্থাপনায় শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব অবিসম্বাদী ও সর্বাধিক।

কোন্ গুণে শরৎচন্দ্র এই অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন? সে এইজন্য যে, তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে কেবলমাত্র মানুষের উপরই তাঁর সকল মনোযোগ সংহৃত করেছিলেন- মানুষ-ব্যতিরিক্ত কোন অবাস্তব প্রসঙ্গের উত্থাপনায় সময় ও উদ্যম ক্ষেপ করেননি। মানুষ ও মানুষের হৃদয় এই ছিল তাঁর একান্ত অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। মানুষ যে-পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে বাস করে সেই পারিপার্শ্বিকের উন্মোচনে তাঁর তাদৃশ উৎসাহ দেখা যায়নি, নিসর্গের রূপ বর্ণনায় তাঁর সামান্যই অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়েছে; এমনকি যে মানুষ বা মানুষী তাঁর মুখ্যমনোযোগের বস্তু, তার দৈহিক রূপসৌন্দর্য বর্ণনায়ও তিনি পাতার পর পাতা ভরাতে যাননি বঙ্কিমচন্দ্রের কিংবা অন্য দু-একজন অগ্রগণ্য লেখকের ধরনে। তাঁর একমাত্র চিত্রিতব্য বিষয় ছিল মানুষ ও তার মন। চরিত্রসমূহের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণে তিনি বিশেষ আনন্দ পেতেন। তবে সেখানেও কথা আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত জটিল কুটিল মনের বিশ্লেষণের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল না; সমাজের প্রচলিত অনুশাসন বা সংস্কারের সঙ্গে অন্তরের সহজ প্রবৃত্তির যে-সংঘাত, সেই সংঘাতজনিত আলোড়নের ছবি ফুটিয়ে তোলাতেই ছিল তাঁর শিল্পিমনের সমধিক স্ফূর্তি। শরৎচন্দ্র তাঁর বর্ণিত চরিত্রগুলির আবেগজীবনের রূপায়ণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাঙালী যে অত্যন্ত ভাবাবেগপরায়ণ জাতি সেটা শরৎচন্দ্রের লেখা পড়লে যত সুনিশ্চিত-ভাবে উপলব্ধি করা যায় এমন বোধকরি আর কারও লেখা থেকে যায় না। অচরিতার্থ প্রেম, সমাজ নিষিদ্ধ অথচ তৎসত্ত্বেও অদম্য ভালবাসার আবেগ, বন্ধ্যাত্বের বেদনা তথা মাতৃত্বের ক্ষুধা, সন্তানবাৎসল্য, ভ্রাতৃস্নেহ, নারীর সেবাপরায়ণতা, বিদ্রোহের তেজ প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবাবেগকে শরৎচন্দ্র অতিশয় চমৎকার শিল্পরূপ দান করেছেন। বাংলার সমাজজীবন, বিশেষ, পল্লী-সমাজজীবনের চিত্ররূপ উপস্থিত করতে গিয়ে দুটি কাজ তিনি বিধিমতে নিষ্পন্ন করেছেন। এক, বাংলার পল্লীবাসী সাধারণ নর-নারীর স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের উদ্ঘাটন; দুই, বাংলার সমাজে প্রচলিত

একাধিক গতানুগতিক মূল্যবোধকে সজোরে আঘাত হানা। অর্থাৎ, তাঁর লেখনী বাস্তবতা ও আদর্শবাদ—এই দুই খাতেই যুগপৎ প্রবাহিত হয়েছে। বাঙালী চরিত্রের মানসিক গঠন বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবের ধাত বিশ্লেষণ করে তিনি তার কতকগুলি অনুচিত সংস্কারকে চূড়ান্ত রকমের সমালোচনা করেছেন। বাঙালীর অন্তরে তিনি বিদ্রোহের আগুন পূরে দিয়েছেন। এইখানেই তাঁর শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা।

তবে ক্ষেত্র বিশেষে রক্ষণশীলতার অনুকূলেও শরৎচন্দ্র তাঁর অমিত লেখনীর শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। শিল্পী-মনের প্রবণতা অনুযায়ী কখনও প্রগতি-শীলতা কখনও রক্ষণশীলতা এই দুই খাতেই তাঁর লেখনীর আবেগ চালিত হয়েছে। আমরা যথাস্থানে এ বিষয়টির আরও বিস্তারিত আলোচনা করবো।

শরৎচন্দ্রের শিল্পের সার্থকতা বিধানে ভাষা একটি প্রধান সহায় হয়েছে। এমন মনোমুগ্ধকর ভাষা বাংলার খুব কম লেখকেরই লেখনীমুখে নিঃসৃত হয়েছে। শুধু ভাষা বললে কমই বলা হয়, বলতে হয় তাঁর স্টাইল, ভাষার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত তাঁর ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ। শব্দ সম্পদ, শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, বাক্যগঠনের রীতি, চিন্তার ছাঁচ, বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গী সব জড়িয়ে এবং সে সবকেও ছাড়িয়ে তাঁর ওই স্টাইল। স্টাইলের জাদুতে শরৎচন্দ্র বাঙালীর চিত্ত হরণ করেছেন। শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে লিখিত এক পত্রে শরৎচন্দ্র বিনয় করে অবশ্য বলেছেন যে, "ভাষার ওপরে দখল আমার চিরদিনই কম; শব্দসম্পদ যে কত সামান্য এ সংবাদ আর যার কাছেই লুকোনো থাক্, তোমাদের কাছে থাকবার কথা নয়।" কিন্তু এই বিবৃতিকে সত্য বলে গ্রহণ করবার হেতু নেই। আর যদি সত্য বলে গৃহীত হয়ও সেক্ষেত্রেও বলবার কথা এই যে, ওই যে তিনি শব্দ সম্পদের "সামান্যতা" নিয়ে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন ওর মধ্যেই রয়েছে তাঁর ভাষার যথার্থ শক্তি। নিসর্গবর্ণনা, প্রতিবেশচিত্রণ, বর্ণিত চরিত্রসমূহের দেহ সৌষ্ঠবের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ এ সমস্ত বিষয়ের বিবরণ দানে তিনি তাঁর মনোযোগ ক্ষেপ করেননি বলেই তাঁর শব্দ-সম্পদ স্বতঃই 'সামান্য' রয়ে গেছে। শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বের প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদে তিনি তাঁর কবিত্বশক্তির ন্যূনতা নিয়ে যে আক্ষেপোক্তি করেছেন সেটা আসলে আক্ষেপোক্তি নয়, সেটা তাঁর আত্মশক্তিতে বিশ্বাসেরই এক ধরনের প্রকাশ। আত্মশক্তিকে এখানে ভাষার শক্তি বলে বুঝতে হবে। ফলতঃ শব্দসম্পদের বিশালতা বা বিস্তারের মধ্যে তো শিল্পীর চাতুর্য নিহিত

থাকে না, শিল্পীর চাতুর্য নিহিত থাকে যে সমস্ত শব্দ নিয়ে শিল্পীর সচরাচর কারবার সেই সমস্ত শব্দ সাজাবার কায়দার মধ্যে এবং কোথায় কোন্ শব্দের উপর ঝোঁক আরোপ করতে হবে তার ভঙ্গীর মধ্যে।

এই মানদণ্ডে বিচার করলে শরৎচন্দ্রের ভাষার কি কোন তুলনা হয়? শরৎচন্দ্রের যে কোন উপন্যাসের যে কোন পরিচ্ছেদের বর্ণনাংশের যে কোন পাঁচ-ছয় লাইন পর পর তুলে আভ্যন্তর পাঠের রীতিতে বিচার করলেই বুঝতে পারা যাবে তাঁর শব্দপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, শব্দের ওজন ও সংযম, অন্বয়ের রীতি, অভীপ্সিত অর্থের স্পষ্টতা ও লক্ষ্যবেধিতা। এই থেকে আরও একটা কথা যা মনে আসে তা হলো এই, শরৎচন্দ্র মূলতঃ পল্লীভিত্তিক লেখক হলেও তাঁর ভাষাশিল্প ছিল দরবারী গুণযুক্ত অর্থাৎ নাগরিক। নাগরিক বৈদগ্ধ্যের সুবাসে তাঁর স্টাইল ভরপুর। ভাস্করসুলভ নিপুণযত্নে পাথর কেটে কেটে মাপজোপ করে বসানোর মত তিনি প্রতিটি শব্দ মেপে মেপে ওজন করে বসাতেন। শব্দগুলির উচ্চারণগত ধ্বনি এবং পাঠকের মনের উপর সেই ধ্বনির সম্ভাবিত প্রতিক্রিয়া খুঁটিয়ে বিচার করে দেখে তবে তিনি শব্দ ব্যবহার করতেন। এই প্রক্রিয়া ভাষাশিল্পের একান্তই নাগরিক প্রক্রিয়া। মননশীলতা এর পরতে পরতে বিধৃত। যাকে বলে 'অশিক্ষিতপটুত্ব' কিংবা দৈবানুগ্রহপুষ্ট শিল্পশক্তি, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই—এ সম্পূর্ণই সচেতন মনের এক শিল্প। অনুশীলন ভিন্ন এ শিল্প আয়ত্ত হয় না, পরিমার্জনা ভিন্ন এ শিল্পের সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় না।

শরৎচন্দ্র যে কতবড় ভাষাশিল্পী ছিলেন তার যথাযথ মূল্যায়ণ এখনও হয়নি। হলে দেখা যাবে তিনি এই ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু লেখককেই নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। ভাষার অসাধারণ চিত্তাকর্ষক ক্ষমতা তাঁর হাতে বাঙালী পাঠকের অন্তরে প্রবেশের আসল চাবিকাঠিটি তুলে দিয়েছে। আর বাঙালী পাঠকও যে তাঁকে তাঁদের অন্তরে অবিচলিত আসন দান করেছেন তা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ এই ভাষার গুণে প্রভাবিত হয়ে। প্রভাবক্রিয়াটা কখনও সজাগ স্তরের, কখনও অজাগ। বোধহয় খতিয়ে দেখলে অজাগ অংশই বেশী। বাঙালী পাঠক তাঁদের অজান্তে অথবা অর্ধজ্ঞাতসারে শরৎ-সাহিত্যের ঐকান্তিক ভক্তে পরিণত হয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের রচনারীতি থেকে এইবারে শরৎচন্দ্রের রচনার বিষয়ের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক কিয়ৎ পরিমাণে।

সকলেই জানেন শরৎচন্দ্র পুরুষচরিত্র অপেক্ষা নারীচরিত্র অঙ্কনে সমধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। নারীচরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি যেন তাঁর অন্তরের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়েছেন। শুধু যে পল্লী বাংলার মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত স্তরের সাধারণ সতীসাধ্বী পতিগতপ্রাণা গৃহবধূ, বালবিধবা, অরক্ষণীয়া অনূঢ়া কন্যা, প্রৌঢ়া জননী প্রভৃতি নানান ধরনের নারী-চিত্রই তাঁর বর্ণিতব্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা-ই নয়; সমাজ-পৈঠার বহির্ভূত সাধারণের অবজ্ঞাত তথাকথিত পতিতা ও ভ্রষ্টাদের উপরও তিনি তাঁর শিল্পদৃষ্টির মমত্ব অর্পণ করেছেন পরম ঔদার্যে। তাদের বহিরঙ্গ ক্লেদাক্ত জীবনের অন্তরালস্থিত সহজাত নারীত্বের মহিমাকে রূপায়িত করেছেন একান্ত যত্নে। এইজন্য তাঁকে সমাজের রক্ষণশীল অংশ থেকে কম নিন্দাবাদ সহ্য করতে হয়নি কিন্তু সমস্ত কটু সমালোচনার ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁর মানবিকতার অবস্থানে অবিচলিত থেকেছেন। মানুষের স্খলন-পতনকে অতিক্রম করেও যে তার অন্তর্নিহিত মানব-মহিমা অজেয় থাকে এই ভাবটিকে তিনি বারবার তাঁর পাঠকের মনোযোগের সামনে তুলে ধরেছেন অকম্পিত হস্তে। সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী, বিজলী প্রভৃতি চরিত্র এই মন্তব্যের প্রমাণ।

পক্ষান্তরে, পতিপ্রাণা সতী-সাধ্বী নারীর আদর্শ তুলে ধরেছেন বিরাজ-বৌ (বিরাজ-বৌ), সুরবালা (চরিত্রহীন), সরযূ (চন্দ্রনাথ), অন্নদাদিদি (শ্রীকান্ত), ষোড়শী (দেনা-পাওনা), প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। শ্বশুরকুল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা আত্মমর্যাদাদৃপ্তা নারীর মহিমা ফুটিয়েছেন পণ্ডিতমশাই উপন্যাসের কুসুম চরিত্রের মধ্য দিয়ে। (পল্লীসমাজের রমা বৈধব্যের অভিশাপদীর্ণা ও কৃত্রিম সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতির নিরন্তর সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত-হৃদয়া নারীর এক বেদনাকরুণ উদাহরণ।) বিন্দুর ছেলের বিন্দু আর রামের সুমতির নারায়ণী, বড়দিদির মাধবী আর মেজদিদির হেমাঙ্গিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে স্নেহবাৎসল্যের এক অপরূপ স্নিগ্ধতার আলেখ্য। অরক্ষণীয়ার পোড়াকাঠ ভামিনীর চরিত্রে রূপ পেয়েছে কোন কোন নারীর আপাত-রুক্ষতার খোলসের অন্তরালে যে স্নেহের ফল্গুধারা বহমান থাকে তার দ্যুতির ঔজ্জ্বল্য। পল্লীসমাজের জ্যেঠাইমা চরিত্রে পাই প্রৌঢ়া জননীর বিচক্ষণ সংসারবুদ্ধি ও ন্যায়ের প্রতি পক্ষপাত।

কিন্তু এসব কমবেশী বাঙালী সংসারের পরিচিত কাঠামোর চিরাভ্যস্ত নারীরূপের ছবি। শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রের মিছিল ওইখানেই শেষ হয়ে যায়নি। তিনি কতকগুলি বিদ্রোহী চরিত্রও সৃষ্টি করেছেন। যেমন, অভয়া (শ্রীকান্ত ২য় পর্ব), সুনন্দা (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব), কিরণময়ী (চরিত্রহীন), কমল (শেষ প্রশ্ন) প্রভৃতি। অভয়া নিরুদ্দেশ স্বামীর সন্ধানে প্রতিবেশী যুবক রোহিণীকে সঙ্গে করে বর্মা মুলুকে এসেছিল। স্বামীর খোঁজ সে পেয়েছিল কিন্তু তার কদর্য জীবনযাত্রা ও ততোধিক বিকৃত রুচির পরিচয় পেয়ে স্বামীর সঙ্গে একত্র ঘর করার ইচ্ছা তার উবে যায়। ইতিমধ্যে রোহিণী তাকে মনে মনে ভালবাসে। রোহিণীর প্রেমকে মর্যাদা দিয়ে অভয়া তারই সঙ্গে ঘর বাঁধে ও স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে থাকে। অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সাহসিক চরিত্র এই অভয়া। আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজের পুরুষের স্বার্থানুকূল একতরফা অনুশাসনাদির বিরুদ্ধে অভয়া এক মূর্তিমতী বিদ্রোহিনী নারী। পুরুষ দাম্পত্যজীবনের পবিত্রতাকে নষ্ট করে কদাচারী হলে তার কোন সাজা নেই, নারী একটু বেচাল হলেই তার উপর সমাজের রোষ বজ্রাগ্নির মত নেমে আসে—এই নিতান্ত অন্যায্য সংস্কারটাকেই আঘাত করতে চেয়েছে অভয়া তার ভয়শূন্য আচরণের মধ্য দিয়ে। অভয়ার তুল্য নির্ভীক দ্বিতীয় আর একটি চরিত্র নেই গোটা শরৎ সাহিত্যের বিস্তৃত আয়তনের ভিতর। শরৎচন্দ্র প্রয়োজনবোধে কতখানি বিপ্লবী হতে পারেন তার দৃষ্টান্ত রেখেছেন অভয়া চরিত্রের মধ্যে।

শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বের সুনন্দাও একটি বিদ্রোহিনী চরিত্র। তবে তার বিদ্রোহের জাত আলাদা, বিদ্রোহের কারণ ভিন্ন। জৈব জীবনের সমস্যাদির সঙ্গে সে-বিদ্রোহের কোন সম্পর্ক নেই। সুনন্দা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা, বধূ হয়ে শ্বশুরগৃহে আসার পর শ্বশুরকুলের সকলের স্নেহ ও আদরে বেশ সুখেই তার দিন কাটছিল, কিন্তু একটি অন্যায়ের প্রতিবিধানে তেজস্বিনী প্রতিবাদিনীর ভূমিকা গ্রহণ করে সে আশ্চর্য চরিত্র-মহিমার পরিচয় দিলে। কোন একটি ঘটনায় যেদিন সে জানতে পারল তার ভাশুরের অর্জিত সম্পত্তির একটা অংশ এক অনাথিনী তাঁতি-বৌ ও তার শিশুপুত্রকে ঠকিয়ে কৌশলে কেনা সম্পত্তি, সেদিন সে মুহূর্তমাত্রেরও দ্বিধা না করে স্বামী-পুত্রের হাত ধরে শ্বশুরের ভিটা ত্যাগ করে এক পোড়ো বাড়িতে এসে ঠাঁই নিলে এবং জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার শত উপরোধেও আর প্রাচুর্যের সংসারে ফিরে গেল

না। অন্যায়কে রুখতে গিয়ে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণের এই গৌরবজনক ঘটনা আরও মহিমান্বিত হয়েছে এই কারণে যে, এই ক্ষেত্রে অন্যায়-অসহিষ্ণুতা এসেছে এক গ্রাম্য নারীর কাছ থেকে, যে শ্রেণীর নারী জমিজিরাত সংক্রান্ত বৈষয়িক ব্যাপারে পুরুষের প্রশ্নহীন আনুগত্য স্বীকার করে নিতেই সচরাচর অভ্যস্ত। কিন্তু সুনন্দার তেজটুকু এসেছে কোথা থেকে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তার তেজের উৎস হলো তার সন্ন্যাসীকল্প শাস্ত্রজ্ঞ পিতার শিক্ষা, যে-শিক্ষায় ধর্মকে সব-কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে। বাংলার অজ-পাড়াগাঁর অভ্যন্তরেও যে এমন মহীয়সী চরিত্র থাকতে পারে সেইটা একটা শুভলক্ষণ ও সর্ববিধ প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করেও বাঙালী জাতির টিঁকে থাকার পক্ষে একটা মস্ত যুক্তি।

শরৎচন্দ্রের অনেক চরিত্রই বাস্তবের আদল থেকে নেওয়া। এই চরিত্রটির কোন বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা বলা যায় না, তবে এটি যদি কল্পিত চরিত্রও হয় তাহলেও তার মূল্য কমে না। চরিত্রটির সম্ভাব্যতা তথা প্রতীতি-যোগ্যতার মধ্যেই তার শক্তি নিহিত।

কিরণময়ী একটি অত্যাশ্চর্য চরিত্র। এমন বুদ্ধিদীপ্ত সপ্রতিভ সর্বসংস্কার-মুক্ত সনাতন শাস্ত্র শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী নারী বোধকরি শেষ প্রশ্নের কমলও নয়। কমলের সঙ্গে কিরণময়ীর মূলগত পার্থক্য এখানে যে, কমল মুখে সনাতন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও আচরণে ভারতীয় নারীর স্বভাবগত সংযমে বৃতা। সে একাদশী তিথিতে হবিষ্যান্ন করে, প্রায়ই আলু-ভাতে ভাত ফুটিয়ে খায়, কঠোর নিয়ম-শাসনে বদ্ধ তার জীবন। কিরণময়ীর ওসব বালাই নেই। সে যা বিশ্বাস করে তা-ই করে। সে ঈশ্বর মানে না, শাস্ত্রের পবিত্রতায় বিশ্বাস করে না, ভোগবাসনাবঞ্চিত রিক্ত নারীজীবনে স্বামী বর্তমানেই অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে অনুচিত সম্বন্ধ পাতে। প্রতিহিংসার তাড়নায় পত্নীপ্রেমে মাতোয়ারা এবং তার প্রতি উদাসীন উপেন্দ্রকে জব্দ করবার মতলবে তার অনভিজ্ঞ ভাই দিবাকরকে প্রলুব্ধ করে বর্মা মুলুকে তাকে ভাগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এ স্বৈরাচার অশিক্ষিতা নারীর স্বৈরাচার নয়, এর পিছনে আছে বুদ্ধি দিয়ে আচরণকে সমর্থন করবার প্রখর মননশীলতা। শাস্ত্র পড়েই সে শাস্ত্রকে অস্বীকার করতে শিখেছে। স্বামী বেঁচে থাকতে স্বামীর সহায়তায় সে শাস্ত্র-গ্রন্থগুলি তন্ন তন্ন করে ঘেঁটেছে, তার ফলে শাস্ত্রনির্মাতা পুরুষদের কাপট্য

আর ভণ্ডামিটাই শুধু তার চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস স্থাপনের কোন কারণ সে খুঁজে পায়নি।

কিন্তু এমন যে সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী কিরণময়ী, সে কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না। বুদ্ধি আর প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয়ে সে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র শেষ অবধি তাকে পাগল বানালেন কেন? তিনি কি কিরণময়ীকে তার বিশ্বাসে বিজয়িনী রেখে চরিত্রহীন উপন্যাসের অন্যবিধ উপসংহার করতে পারতেন না? এইখানেই ধাঁধা, আর এই ধাঁধার উন্মোচন-চেষ্টার মধ্যেই আমরা শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের দ্বৈধতার পরিচয় পেতে পারি।

আমার মনে হয় শরৎচন্দ্র একই কালে একজন প্রথম শ্রেণীর বিদ্রোহী লেখক ও রক্ষণশীল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর রক্ষণশীলতা এসেছিল তাঁর রাঢ়দেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণের মজ্জাগত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার থেকে; আর বিদ্রোহের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর বাউণ্ডুলে ভ্রাম্যমাণ ভবঘুরে জীবনযাত্রার ছক থেকে। কৌলিক সংস্কারে তিনি রক্ষণশীল, আর জীবনাচরণে তিনি বিদ্রোহী, বিপ্লবী। এই দুই প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কখনও রক্ষণশীল সত্তা জয়ী হয়েছে, কখনও বিদ্রোহী সত্তা। আলোচ্য ক্ষেত্রে, অর্থাৎ কিরণময়ীর পরিণাম চিত্রণে, শরৎচন্দ্র রক্ষণশীলতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। খুব সম্ভব নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এ কাজ তিনি করেছেন। তাঁর সামনে দুটি দৃষ্টান্ত এ ব্যাপারে পূর্ব-উদাহরণের কাজ করেছে—বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের অন্তিমে কুন্দনন্দিনীর বিষপানে আত্মহত্যা ও কৃষ্ণকান্তের উইলের শেষে রিভলভারের গুলিতে স্বৈরিণী বিধবা রোহিণীর হত্যা। শরৎচন্দ্র অবশ্য আত্মহত্যা বা হত্যার পথে যাননি, মস্তিষ্কবিকৃতির পথে কিরণময়ীর 'উন্মার্গ-গামিতার' শাস্তিবিধান করেছেন। কিন্তু ফল একই দাঁড়িয়েছে। আত্মহত্যা বা হত্যা জনিত মৃত্যুই হোক আর উন্মাদাবস্থাই হোক, লৌকিক বিচারে দুই ধরনের অবস্থাই মৃত্যুর সামিল।

পূর্বসূরীর দৃষ্টান্ত ছাড়াও এ ব্যাপারে কিছু বস্তুগত কারণ শরৎচন্দ্রকে রক্ষণশীলতার অনুকূলে প্রভাবিত করে থাকবে। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র থেকে তার কতকটা আঁচ করা যায়। চরিত্রহীন 'ভারতবর্ষ' মাসিকে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ভারতবর্ষ মাসিকের পরিচালকবৃন্দ উপন্যাসটি immoral বলে মত প্রকাশ করেন ও পাণ্ডুলিপি ফেরত দেন। স্বভাবতঃই শরৎচন্দ্র এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ

ভট্টাচার্যকে (প্রমথবাবু ভারতবর্ষ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন) লিখিত এক চিঠিতে নিতান্ত আক্ষেপের সুরে জানান, বইখানাকে immoral বলায় ভারতবর্ষের পরিচালকদের গোঁড়ামিই শুধু প্রকাশ পেয়েছে, সাহিত্যবুদ্ধি প্রকাশ পায়নি।

সে যাই হোক, তাঁদের যখন সকলেরই এত আপত্তি, সেইজন্য "যাতে এটা in strictest sense moral হয় তাই উপসংহার করিব।" (শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, দ্বাদশ সম্ভার, পত্র-সংকলন, পৃ. ৩৬৩)।

তারই ফলে কিরণময়ী চরিত্রের এবংবিধ পরিণতি। পরিণতিটি স্বাধীন ইচ্ছা প্রসূত নয়, অভিমান প্রসূত। তবে অযৌক্তিক মনে হয় না। বিদ্রোহের আবেশ এবং রক্ষণশীলতার সংকোচনী প্রবৃত্তির মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্বের ফলে কিরণময়ী চরিত্রে যে tension-এর সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিণামে কিরণময়ীর পাগল হয়ে যাওয়া কিছু বেমানান নয়। এরূপ ক্ষেত্রে এই রকম হওয়াই সম্ভব।

॥ ২ ॥

শিল্পী ব্যক্তিত্ব

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মের একশত বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এখন থেকেই এই অসামান্য লোকপ্রিয় সাহিত্যিকের শতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপনার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সরকারী-বেসরকারী উভয় স্তরেই এরূপ প্রস্তুতির কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে জানানো হয়েছে তাঁরা এই উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলী সুলভে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। পক্ষান্তরে বেসরকারী উদ্যোগ-অনুষ্ঠানের মুখপাত্ররূপে শরৎ সমিতি বাঙালীর চিত্তজয়ী এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের স্মৃতি ফলপ্রদভাবে লোকমনে গ্রথিত করে দেওয়ার নানাবিধ উপায়ের কথা ভাবছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা একাধিক প্রস্তাব ও পরিকল্পনা রচনা করেছেন। তাঁরাও সুলভ মূল্যে শরৎ গ্রন্থাবলী প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ সবই শুভ উদ্যোগ সন্দেহ নাই। পরিকল্পনাগুলি সাফল্যমণ্ডিত হলে কিছু কাজের মত কাজ হবে।

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানের প্রাক্‌-মুহূর্তে এই বিশিষ্ট কথাকারের শিল্পমানসের বৈশিষ্ট্য, লেখক-চরিত্র, অন্যান্য রচনাকারদের থেকে কোথায় এই লেখকের রচনার স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি নিয়ে কিছুটা চিন্তাচর্চা করলে মন্দ হয় না। শরৎচন্দ্রকে আমরা 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' এই সম্মাননা পূর্ণ অভিধায় ভূষিত করেছি। কিন্তু কেন এই শিল্পী 'অপরাজেয়', কোন্ গুণে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প অন্য সব লেখকের রচনাকে ডিঙিয়ে বাঙালী পাঠক-পাঠিকার চিত্তমধ্যে অপ্রতিহত প্রবেশাধিকার লাভ করেছে ও সেখানে স্থায়ী আসন দখল করেছে, তাঁর লেখার জাদু কোথায় ও কিসে নিহিত—ওই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া চলে না। তা একটু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। নীচে সে রকম চেষ্টাই খানিকটা করব।

আমার মনে হয় শরৎচন্দ্র খাঁটি অর্থে একজন জাত-শিল্পী আর তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তাঁর রচনার অপরাজেয়তার সংকেত নিহিত। আমাদের দেশে অবসরভোগী জমিদার, অনর্জিত সম্পদের অন্যায়ভোগদখলকারী

অভিজাত শ্রেণীর শহুরে মানুষ, কিংবা চাকুরিজীবী অথবা বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্য থেকেই সাধারণতঃ সাহিত্যিকেরা বেরিয়ে আসেন। বেশীরভাগ লেখকেরই গোত্র-লক্ষণ মেলাতে গেলে দেখা যাবে পূর্বোক্ত তিন গোত্রের কোন না কোন গোত্রের আওতার মধ্যে তাঁরা পড়েন। প্রায়শঃ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণী থেকেই সাহিত্যিক বর্গের ব্যক্তি বেশী আহরিত হয়ে থাকেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রকে এই তিন গোত্রের কোন গোত্রের ভিতরই ধরানো যাবে না। তিনি জমিদার শ্রেণী থেকেও আসেননি, অকর্মা অভিজাত বর্গের মানুষও তিনি নন, আবার চাকুরি বা ব্যবসায় সম্বল মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর লোকও তাঁকে বলা চলে না। সত্য বটে জীবিকার প্রয়োজনে তাঁকে অনেক বছর রেঙ্গুনে থেকে চাকরি করতে হয়েছিল, কিন্তু চাকরি করে জমানো টাকা থেকে মেয়ের বিয়ে দেওয়া, ছেলেকে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, কিংবা শেষ বয়সে বাড়ি বানানো জাতীয় যে সব আকাঙ্ক্ষা মধ্যবিত্তের চাকরির পশ্চাতে প্রায়শঃ মূলপ্রেরণা রূপে কাজ করে, এই ধরনের কোন আকাঙ্ক্ষাই শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন প্রবাস কিংবা রেঙ্গুনে চাকরি করার মূলে সক্রিয় ছিল না। তিনি ছিলেন জন্মবৈরাগী, উদ্দেশ্যহীন-ভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় রেঙ্গুনে একটা চাকরি মিলে গিয়েছিল, সেখানেই আপাততঃ স্থিতি করেন আর ওই কাজেই বেশ কয়েক বছর লেগে থাকেন। চাকরি করে সংসার ধর্ম নির্বাহ করা, সন্তান পালন, ব্যাঙ্কে টাকা জমানো, ছেলে পড়ানো বা মেয়ের বিয়ে দেওয়া—এ সব কিছুই তাঁর চাকরির পরিকল্পনার অন্তর্গত ছিল না। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রকে যাঁরা কাছে থেকে দেখেছেন তাঁরা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার ছকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কোন-কিছুই মেলে না, মেলানোর উপায় নেই। এই জন্ম-বাউণ্ডুলে সংসার-নিস্পৃহ অতৃপ্ত অশান্ত মানুষটির জীবনতরণী ভাসতে ভাসতে রেঙ্গুনের ঘাটে কিছুকালের জন্য নোঙ্গরের আশ্রয় পেয়েছিল কিন্তু নোঙ্গর তোলবার প্রথমতম সুযোগে সেখান থেকে নোঙ্গর তুলে নিয়েছিল। ভবঘুরে যে-মানুষের প্রকৃতি, অস্থির যাঁর চিত্ত, তাঁর মন দীর্ঘকাল একই ঘাটে বাঁধা থাকবে তা কি কখনও হবার যো আছে? তাই দেখতে পাই লেখকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভাবনার প্রথমতম সুযোগে বাংলার পাঠককুলের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রেঙ্গুনের বাস তুলে কলকাতা চলে এসেছিলেন—পিছনের ফেলে আসা

সঙ্গ ও অনুষঙ্গগুলির জন্য তাঁকে দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে দেখা যায়নি। মজ্জাগত নিস্পৃহ স্বভাবের মানুষের এমনিই ধারা, তার উপর ওই মানুষ যদি শিল্প স্বভাববিশিষ্ট হয় তা হলে তো আরও। শরৎচন্দ্র ছিলেন জাত-শিল্পী, স্বভাবলেখক, তাঁকে কি দীর্ঘদিন একই বন্ধনের বেড়ে আটকে রাখা যায় ?

শরৎচন্দ্রের জীবনের ছাঁচ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর জীবনে গতানুগতিক সংসারযাত্রার প্রভাব লেশমাত্র ছিল না। প্রথম যৌবনে তিনি বার পাঁচেক সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, বছর পাঁচ-ছয় একটানা গানবাজনার চর্চা করেছেন, যাত্রার দলে সখী সেজে গান গেয়েছেন, সাপ ধরার কৌশল ও সাপকে বশ করার প্রক্রিয়া আয়ত্ত করবার জন্য সাপুড়েদের সঙ্গ করেছেন। আরও কত কী। তারপর এসেছিলেন কলকাতায় ভাগ্যান্বেষণে। কিন্তু কলকাতায় তাঁর অন্ন মাপা ছিল না, ফলে সেখানে চাকরির সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে সুদূর রেঙ্গুন মুল্লুকে পাড়ি দিলেন। তার পর অনেক দিন আর ঘরমুখো হবার নাম করেননি। রেঙ্গুনেও জীবন-যাত্রা মোটেই শান্তশিষ্ট রুটিন-মাপা নির্বিরোধ মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা ছিল না।

এই থেকে বোঝা যায় শরৎচন্দ্র এমন এক শিল্পী, যিনি জন্ম-অশান্ত, অস্থিরচিত্ত, অধীর ; নিয়ম-নীতির নিতান্ত বশংবদ বাধ্য মানুষ যাঁকে কোন মতেই বলা চলে না। ইউরোপীয় বোহেমীয় শিল্পী-সাহিত্যিকদের ধরন-ধারণ অনেকটাই তাঁর মধ্যে বর্তিয়েছিল, খুব সম্ভব তাঁরও অজান্তে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লেখকেরই জীবনের ছাঁচ বড় গতানুগতিক। হয় তাঁরা অধুনাবাতিল জমিদার বা অভিজাত জীবনের স্তর থেকে সমাগত, নয় তো নিতান্তই প্রথার দাসত্ব মানা মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত ছাপোষা জীব। পূর্বেই বলেছি, শরৎচন্দ্রকে এঁদের কারও সঙ্গেই এক করে দেখা চলে না। শিল্পী হিসাবে তিনি অনন্যপরতন্ত্র, তুলনা রহিত। তিনি নিজেই নিজের তুলনা, তাঁর দোসর খুঁজতে যাওয়া বৃথা। দোসর যদি খুঁজতেই হয় এদেশে তাঁর জুটি মিলবে না, জুটি মিলবে ইউরোপে, যে-দেশের শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের মানসিকতা বিশিষ্ট একাধিক লেখকের নজির মিলবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রুশ লেখক ডস্টয়েভ্স্কি কিংবা গর্কি, নরওয়েজিয়ান লেখক হামসুন, আইরিশ কবি ডেভিস, ইংরেজ কবি গোল্ডস্মিথ, শেলী ও বায়রণ, ফরাসী গল্প-লেখক মোপাশাঁ, আমেরিকান কবি হুইটম্যান প্রমুখের নাম করা

যায়। গর্কির জীবনের ছকের ভিতর গতানুগতিকতার নামমাত্র ছিল না সে যাঁরা গর্কির আত্মজীবনীর তিনখণ্ড পড়েছেন তাঁরাই ভাল করে জানেন। হামসুন তাঁর হাঙ্গার উপন্যাসে দারিদ্র্যের সঙ্গে নিয়তসংগ্রামরত এক সাহিত্যযশোপ্রার্থী যুবকের যে-ছবি এঁকেছেন সে তাঁর নিজেরই জীবনের প্রক্ষেপ মাত্র। গোল্ডস্মিথ একটি বাঁশী মাত্র সম্বল করে সম্পূর্ণ কপর্দক শূন্য অবস্থায় সারা ইউরোপ পরিভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন এবং বাঁশী বাজিয়ে পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন। হুইটম্যান পেট চালাবার তাগিদে হেন কাজ নেই যা করেননি—কাগজে হকারি থেকে প্রেসের কম্পোজিটারি পর্যন্ত সব কাজেই হাত মক্স করেছিলেন উদ্দেশ্যহীনভাবে শহর থেকে শহরান্তরে ঘুরে বেড়াবার কালে। মোপাশাঁ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য নৈশ প্যারিসের অন্ধকার গলি ঘুঁজিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন রাতের পর রাত—এই সব নিশীথ পরিক্রমার অভিযানে বাধ্য হয়ে যে হলাহল পান করতে হয়েছে তাকেই অমৃতে রূপান্তরিত করেছেন তাঁর অপূর্ব শিল্পকর্মের ভিতর।

শরৎচন্দ্রকেও এঁদেরই গোত্রের শিল্পী মনে করতে হবে। তবেই তাঁর রচনার গহনে প্রবেশের প্রাথমিক চাবিকাঠির আমরা সন্ধান পাব। এদেশের শান্ত নির্জীব পদে পদে সংস্কার চালিত 'ভদ্রলোক' লেখকদের সঙ্গে তাঁর কোনই মিল নেই—না ব্যক্তিত্বে, না লেখার ধাঁচ-ধরনে। তাঁর লেখা বিদ্রোহের তেজে পূর্ণ, বৈপ্লবিকতার সংকেতবাহী। (যদিও উত্তর জীবনে এই বৈপ্লবিকতা তিনি পুরাপুরি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি—বৈপ্লবিকতার ভিতর রক্ষণশীলতার খাদ এসে মিশেছিল।) গতানুগতিক শাস্ত্রশাসনের ছকবাঁধা রাস্তায় চলতে অভ্যস্ত সনাতন আইন-শৃঙ্খলার ভক্ত নিরীহ বাঙালী লেখকের থেকে শরৎচন্দ্রের জাত-গোত্র এতই আলাদা যে, এই লেখক বাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেমন করে আবির্ভূত হলেন সেইটে ভেবে এক এক সময় অবাক্ হয়ে যেতে হয়। বাংলা সাহিত্যের পূর্বসূরী দিক্পাল কারও সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য নেই, বৈসাদৃশ্য অতি সুপ্রকট। বিদ্যাসাগর, হেম-নবীন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর, দ্বিজেন্দ্রলাল, দীনেশচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী,—কোন লেখকের সঙ্গেই তাঁকে মেলাবার উপায় নেই। বাংলার লেখকগোষ্ঠী সমূহের পরিচিত চৌহদ্দিতে তাঁর পদপাত অনুপস্থিত। যদি তাঁকে আদৌ পূর্বসূরী বা উত্তরসূরী কারও সঙ্গে মেলাতে হয় তো এই ক'টি নাম মনে পড়া স্বাভাবিক—পূর্বসূরীদের মধ্যে মধুসূদন,

উত্তরসূরীদের মধ্যে কাজী নজরুল ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেখানেও কথা আছে। যদিও এঁদের সকলেই জীবনীশক্তির দীপশিখা একই সঙ্গে দুই প্রান্তে জ্বালিয়ে শক্তিকে ত্বরায় নিঃশেষ করেছেন, তাহলেও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কোথায় যেন এঁদের একটা বড় রকমের বেমিলও রয়েছে। মধুসূদন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির শিল্পী হলেও অভিজাত গোত্রের শিল্পী—বৃত্তিতে ব্যারিস্টার। কাজী নজরুল একদা লেটোর দলে গান বাঁধতেন, পরে যুদ্ধে সৈনিকদলে নাম লিখিয়েছিলেন; কিন্তু উত্তর কালে নজরুলের যে-জীবনের সঙ্গে আমরা পরিচিত তা একান্তভাবেই কলকাতার নাগরিক জীবন-যাপন পদ্ধতির বাঁধা-ধরা ছকটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নজরুলের প্রথম জীবনের বিদ্রোহের বেগ পরবর্তী জীবনের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার প্রভাববৃত্তের মধ্যে এসে বহুল পরিমাণে শান্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বিদ্রোহ থেকে ভক্তিতে চলে এসেছিলেন। বিদ্রোহ থেকে ভক্তিবাদে সমুত্তীর্ণ হতে গিয়ে তিনি তাঁর অতীতকেই শুধু অস্বীকার করেননি, এমনকি নিজের জীবনে বিপর্যয়ও ডেকে এনেছেন নিজের অজান্তে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী জীবনের ছাঁচে বাঁধভাঙা প্রকৃতির বিশেষ পোষকতা দেখতে পাওয়া যায়। গতানুগতিকত্বের সংস্কার দ্বারা তাঁর অশান্ত ও সততসমালোচনাপ্রবণ চিত্তকে শাসিত রাখা অসম্ভব ছিল। তদুপরি তাঁর মজ্জাগত মনোবিকলন ও ব্যবচ্ছেদের অভ্যাস সর্বপ্রকার প্রচলিত সংস্কারের প্রতি তাঁকে আরও বেশী অশ্রদ্ধাপরায়ণ করে তুলেছিল। কিন্তু মানিক নিয়ম-না-মানা, বাঁধনছেঁড়া প্রবৃত্তির শিল্পী হলেও নিরাশ্রয় ছিলেন না—চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এসে তিনি মার্কসবাদী প্রত্যয়ের নিশ্চিত একটি অবলম্বন পান। এই অবলম্বন তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল—তাঁকে উদ্দেশ্যহীন মনোবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার নৈরাজ্যবাদী শূন্যতা থেকে রক্ষা করেছিল।

এই সব দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এবারে আমরা শরৎচন্দ্রের উপরে আরও খানিকটা মনোযোগ অর্পণ করতে পারি। কী ধাতে এই শিল্পী গড়া ছিলেন ওই মনোযোগক্রিয়া থেকে তার বেশ কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। বাল্যবন্ধু লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"চারু, আমার মতো করে তোমাদের যদি উপন্যাস রচনা করতে হতো তাহলে তোমরা উপন্যাস লিখতেই পারতে না। এমন দিন গেছে, যখন দু-তিনদিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে

বেড়িয়েছি। কত বাড়িতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে—তারা বড়লোক। কত হাড়ী বাগদির বাড়িতে আহার করেছি। গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশেছি, তাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তারপর খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ। তাছাড়া আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা।"

এই থেকেই বুঝতে পারা যাবে শরৎচন্দ্রের লেখক জীবনের ভিত্তি কোথায় ও তার বুনিয়াদ কত সুদৃঢ়। আমাদের মধ্যবিত্ত আবহাওয়ায় বর্ধিত প্রথাবদ্ধ মূল্যবোধ গঠিত গতানুগতিক ধারায় জীবন-যাপনকারী লেখকদের করণ-কারণের সঙ্গে তাঁর কিছুই মেলে না। তাঁর লেখবার স্টাইলও অনন্যসাধারণ, আমাদের প্রচলিত ঔপন্যাসিক-গল্পকারদের লেখবার রীতিপদ্ধতির থেকে আলাদা। কিন্তু সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। বারান্তরে শরৎচন্দ্রের স্টাইল সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

॥ ৩ ॥

স্টাইল

কথায় বলে 'স্টাইল ইজ দ্য ম্যান', স্টাইল লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ। কথাটি শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে বিশেষভাবে খাটে। শরৎচন্দ্রের রচনার ভঙ্গী, শব্দ প্রয়োগের বিশেষত্ব, শব্দ সাজাবার কায়দা, বাক্য ব্যবহারের বিশেষ ডৌল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শরৎচন্দ্রের লেখক-ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত স্পষ্টরেখায় প্রতিভাত। অবশ্য স্টাইল বলতে শুধু লিপি-বৈশিষ্ট্যকেই বোঝায় না, তার উপরে আরও অনেক কিছু বোঝায়। স্টাইলের দর্পণে গোটা মানুষটির ছবিই ভেসে ওঠে পাঠকের চোখের সামনে। কাজেই স্টাইলের মানদণ্ডে শরৎচন্দ্রকে একবার বিচার করে দেখলে মন্দ হয় না।

একটা কথা গোড়াতেই বলে নেওয়া ভাল। শরৎচন্দ্র মুখ্যতঃ পল্লীপ্রধান বিষয়বস্তুর অবলম্বনকারী ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হলেও, এবং তাঁর পল্লী-ভিত্তিক রচনাগুলিতেই শিল্পোৎকর্ষ সমধিক প্রকাশিত হলেও, তিনি আসলে নাগরিক মেজাজের শিল্পী। বৈদগ্ধ্য, দরবারী রীতি, পরিশীলন, প্রযত্ন তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। তিনি পল্লীগ্রামের চিত্র-চরিত্র নিয়ে কথাসাহিত্য রচনা করলেও যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে সেটি করেছেন তা কিন্তু আদৌ গ্রামীনতা-সুলভ শৈথিল্য, শ্লথতা কিংবা তথাকথিত অশিক্ষিতপটুত্বের দ্বারা স্পৃষ্ট নয়; ওই রচনার পরতে পরতে আছে একজন নাগরিক শিল্পিজনোচিত মনোযোগ, যত্ন ও অনুশীলনীর প্রভাব। শরৎচন্দ্র নিজেকে 'গেঁয়োলোক' বলে চালাবার চেষ্টা করতেন, আলাভোলা দাঠাকুর গোছের বেশবাস পরে থাকতে ভালবাসতেন, পরনে ছিল থান ধুতি, গায়ে বালাপোষ, পায়ে তালতলার চটি, তাইতে লোকের সহজেই মনে হতে পারতো তাঁর শিক্ষাদীক্ষা গ্রাম্যস্তরের, শুধু দৈবানুগ্রহপুষ্ট অশিক্ষিত—অথবা অর্ধশিক্ষিত—পটুত্বের দ্বারা তিনি বাংলার জনচিত্ত জয় করেছিলেন। কিন্তু এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। তাঁর মত সীরিয়াস ধাতের শিল্পী বাংলা কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। এই ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান, ভাষা শিল্পের চর্চায় বুঝি তিনি প্রথমোক্ত দিক্‌পালদ্বয় অপেক্ষাও অধিক মনোযোগ-

পরায়ণ ছিলেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষাও নিতান্ত সাধারণ স্তরের ছিল না। এ বিষয়ে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না, তবে তিনিও একজন অধ্যয়ননিষ্ঠ লেখক ছিলেন। পল্লীভিত্তিক উপন্যাসিকের পক্ষে লোকসাহিত্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী, কিংবা বাংলা সাহিত্যের এঁদো-ডোবা-সদৃশ মঙ্গলকাব্যগুলির অনুশীলন করাই স্বাভাবিক ছিল ; কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর ধার দিয়েও যাননি। তিনি চর্চা করেছেন ইউরোপীয় সমাজতাত্ত্বিক রচনাবলীর, অর্থনীতি ও রাজনীতি বিজ্ঞানের, ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের। প্রসিদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক লেখক হার্বার্ট স্পেন্সারের তিনি একজন সবিশেষ ভক্ত ছিলেন। "পরের লেখা সাহিত্য আমি খুব কম পড়েছি। ও আমার ভাল লাগে না। আমার বাড়িতে যে বই আছে তার অধিকাংশই সায়েন্সের বই।" দিলীপকুমার রায়কে একবার সখেদে লিখেছিলেন তাঁর হওয়া উচিত ছিল একজন সমাজবিজ্ঞানী, এই দেশের পচা জলহাওয়ার দোষে হয়ে দাঁড়িয়েছেন একজন লোকমনোরঞ্জক গল্পকার। এই আক্ষেপোক্তি থেকেই বোঝা যায় মানুষটি কী ধাতে গড়া ছিলেন এবং কোন্ দিকে তাঁর অন্তরের সহজ প্রবণতা ছিল।

তবু যে তিনি বাংলাদেশের জনমনে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একজন ন্যালাখ্যাপা বাউণ্ডুলে গোছের দৈবাশীর্বাদধন্য লেখকের ভাবমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কিত আলোচনাদিতে একজন সীরিয়াস তীক্ষ্মমননজীবী সচেতন শিল্পীর ভাবমূর্তির সাক্ষাৎ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়—তার জন্য তিনি নিজেই কম বা বেশী পরিমাণে দায়ী ছিলেন। পূর্বেই বলেছি তিনি তাঁর বৈদগ্ধ্য ও পরিশীলনকে সযত্নে গোপন করে বাইরে একজন 'দাঠাকুর' সেজে থাকতে ভালবাসতেন। শুধু তাই নয়, এই ভাবে লোককে ধোঁকা দিয়ে তিনি এক ধরনের আমোদ পেতেন। শিল্পী মনের কত রকমের খেয়াল থাকে, এও একটা খেয়াল। তাঁর সম্বন্ধে কত আজগুবি জনশ্রুতি সমাজে প্রচলিত ছিল, কোনদিন তিনি তার প্রতিবাদ করেননি, বরং সে সম্বন্ধে এক অদ্ভুত রহস্যময়তা অবলম্বন করে তিনি সেই সব ভিত্তিহীন কিংবদন্তী আর গুজবকে অকারণ পল্লবিত হতে দিয়েছেন। এই থেকে লোকমনে একটা ধারণা মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি গ্রামীণ ধাতের শিল্পী কিন্তু মোটেই তা তিনি ছিলেন না। বিশেষ ভাষাশিল্পের বুননে তাঁর মত সচেতন নাগরিক মেজাজের কারিগর আমাদের কথাসাহিত্যে তার আগে বা পরে অল্পই আবির্ভূত

হয়েছে। শরৎচন্দ্রের যে-কোন উপন্যাসের যে-কোন অংশের যে-কোন অনুচ্ছেদ বা বাক্যসমষ্টির আভ্যন্তর পাঠ বিশ্লেষণের দ্বারা এ কথার প্রমাণ করা চলে। কিন্তু তার আগে তাঁর শিল্পী-মানসিকতার সম্পর্কে আরও দু'একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্র বলতেন তিনি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসসমূহ তন্ন তন্ন করে পড়েছিলেন, এক চোখের বালি উপন্যাসই কমপক্ষে দুশো বার পড়েছিলেন। কেন পড়েছিলেন ? রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের ভাবের জগতে বিচরণের অভিপ্রায়ে কি ? রবীন্দ্র-ভাবাদর্শকে নিজ জীবনের চিন্তার ছাঁচের ভিতর প্রতিফলিত করবার জন্য কি ? না, তা মোটেই নয়। শরৎ-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন রবীন্দ্র-ভাবজীবন আর শরৎ-ভাবজীবনে দুস্তর পার্থক্য। শরৎচন্দ্র প্রকৃতিপ্রেমে কিংবা ঈশ্বরচেতনায় কখনও স্ফূর্তি অনুভব করেননি, তাঁর সমগ্র মনোযোগ সংলগ্ন ছিল মানুষে। মানুষ নামক অত্যাশ্চর্য জীবটিকে কেন্দ্র করে তাঁর তাবৎ কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা স্ফূর্তিমন্ত হয়েছে। তাই যদি হবে তো তাঁর রবীন্দ্র-কথাসাহিত্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার কী দরকার ছিল ? দরকার ছিল স্টাইলের পরিশীলনের জন্য, ওই সমনোযোগ ভাষাচর্চার বকযন্ত্র থেকে স্বকীয় ভাষারীতি পরিস্রুত করবার জন্য। স্বকীয় স্টাইল শরৎচন্দ্র বিধিমতেই আয়ত্ত করে-ছিলেন। তাঁর স্টাইলের কোন দোসর নেই বাংলা সাহিত্যে, আগের বা পরের কোন প্রতিস্পর্ধীই আজ পর্যন্ত তাঁকে এই ক্ষেত্রে হঠাতে পারেননি। তাঁর ভাষার জাদু তাঁর সাহিত্যের এক প্রধান সম্পদ।

জাঁ-জাঁক রুশো সম্বন্ধে একটা কথা শুনতে পাওয়া যায় তিনি প্রতিটি বাক্য রচনা করেই সঙ্গে সঙ্গে সেটি উচ্চারণ করে পড়তেন। তাঁর কান অনুমোদন করলে তবে তিনি বাক্যটি গ্রাহ্য করতেন এবং রচনামধ্যে স্থান দিতেন। শরৎচন্দ্রের সম্পর্কেও বোধহয় একই কথা বলা যায়। তাঁর ছিল সংগীতজ্ঞের কান—তিনি গায়ক ছিলেন এ কথা সকলেই জানেন। তিনি তাঁর ভাষাদেহের অঙ্গসংস্থান ক্রিয়ায় প্রতিটি শব্দ মেপে মেপে ওজন করে বসাতেন এবং পাঠকমনের উপর সেই সব শব্দের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে কানের সাক্ষ্যের দ্বারা তা যাচাই করে নিতেন। তাঁর ভাষার একটি শব্দও অযত্নরচিত নয়, অযথা প্রযুক্ত নয়, অস্থানে প্রযুক্ত নয়। প্রতিটি শব্দ তার যথাস্থানে সংস্থিত হয়ে বাক্য মাত্রই একটা নিটোল শিল্পের রূপ লাভ করেছে তাঁর হাতে। ভাস্কর যেমন পাথর কুঁদে কুঁদে সযত্ন মনোযোগে

পিণ্ডাকৃতি পাথর থেকে সুগঠিত সুন্দর সব অবয়ব উৎকীর্ণ করে, শরৎচন্দ্রও তেমনি ভাল ভাল শব্দের জটলা থেকে গ্রহণ-বর্জন-নির্বাচনের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত শব্দাদি চয়ন ও তাদের যথাস্থানে বিন্যস্ত করে অপরূপ সব বাক্যের মূর্তি সৃজন করতেন। এ এক অসাধারণ শব্দসজ্জা—দরবারী কারুকার্যের সৌগন্ধ্যে ভরপুর।

শরৎচন্দ্রের ভাষাগঠনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মেজাজের যথেষ্ট পোষকতা ছিল। তিনি অবশ্য বিনয় করে একাধিক জায়গায় বলেছেন তাঁর vocabulary বা শব্দভাণ্ডার খুব কম, তবু যে সেই ভাষা লোকের কেন ভাল লাগে তা তিনি বুঝতে পারেন না। এ কথার উত্তরে পাঠকের পক্ষ থেকে এই বলা যায় যে, তাঁর শব্দবৈভব তাঁর নিজের বিচারে অল্প বলে মনে হতে পারে কিন্তু ওই স্বল্পতার মধ্যেই তাঁর ভাষার সৌন্দর্যের চাবিকাঠি নিহিত ছিল। তিনি পারতপক্ষে বাহুল্য-শব্দ বা দ্বিত্ব প্রয়োগ করতেন না। ভাবকে যথাযথভাবে প্রকাশ করার জন্য ভাষার অনেক ঘষা-মাজা করতেন ও শব্দের economy বিধানে যত্নশীল থাকতেন। শব্দের এই ব্যয়কুণ্ঠ অভ্যাস বৈজ্ঞানিক স্বভাবের দ্যোতক।

বিজ্ঞানীরা বাহুল্য-কথার কারবার করেন না। তাঁরা precision-এর অনুরাগী। শরৎচন্দ্রও ছিলেন এই precision বা যাথাযথ্যের একান্ত ভক্ত। নিজেও তিনি বলেছেন, "আমার ভাষাটা বোধহয় সায়েন্সের বই পড়ার দরুন ঐ-রকম হয়ে থাকবে।" (চন্দননগরের আলাপ-সভা)

শরৎচন্দ্রের যে-কোন উপন্যাসের যে-কোন অংশের রচনাপংক্তি উৎকলন করে এ কথা প্রমাণ করা যায়। শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের কিংবা দত্তার কিংবা পরিণীতার আরম্ভভাগ নেওয়া যাক্। সর্বত্রই এক সচেতন শব্দনিপুণ শিল্পী-স্বভাবের পরিস্ফুরণ লক্ষণীয়। শব্দের সংযম অর্থাৎ অল্প কথায় অধিক ভাব-প্রকাশ, শব্দের সযত্ন বিন্যাস, শব্দের ধ্বনিচেতনা প্রভৃতি গুণে এই প্রারম্ভিক অংশগুলি চকিতেই পাঠকের মনোহরণ করে নেয় এবং পাঠমধ্যে তাঁকে প্রবল-ভাবে আকর্ষণ করে। পরিণীতার আরম্ভটিতে আছে, অধিকন্তু, মৃদু কৌতুকের ঝিলিক। পরিহাসরসরসিকতায় শরৎচন্দ্র যে কম যেতেন না তাঁর রচনাবলীর একাধিক অংশে তার প্রমাণ আছে। কিন্তু এহ বাহ্য। আসল হলো তাঁর ভাষাভঙ্গীর গাম্ভীর্য ও ভাবগভীরতা। দু'একটি উদাহরণ দিলে মন্তব্যটি স্ফুটতর হতে পারে।

চরিত্রহীন উপন্যাসের দুটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। এক, যেখানে কিরণময়ীর সঙ্গে পাঠকের প্রথম পরিচয় হলো ; দুই, যেখানে কিরণময়ীর বৈধব্যের বেশ বর্ণিত হয়েছে। প্রথমাংশ : 'উপেন্দ্র দরজা ঠেলিয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটি কেরোসিনের ডিবা হাতে করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। মাথার উপরে অল্প একটুখানি আঁচলের ফাঁক দিয়া সযত্ন-রচিত কবরীর এক অংশ দেখা যাইতেছে। দেখা গেল, তার একটি মাত্র কেশও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। নিখুঁত সুন্দর মুখের উপর হাতের আলোকসম্পাতে ভ্রূযুগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কাঁচপোকার টিপ চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল এবং ঈষৎ আনত চোখ দুটি দিয়া যে বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল, চতুর্দিকের নিবিড় অন্ধকারে তাহার অপূর্ব জ্যোতি ক্ষণকালের জন্য উভয়কেই বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিল। সতীশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা বাধা পাইয়া বারংবার ফিরিয়া যাইতেছে। সে উপেন্দ্রর গা ঠেলিয়া দিল।'

দ্বিতীয়াংশ : 'এক অপরাহ্নবেলায় কিরণময়ী জ্যোতিষবাবুদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরণে মোটা থানের কাপড়, গায়ে অলংকারের চিহ্নমাত্র নাই, সুদীর্ঘ রুক্ষ কেশরাশি বিপর্যস্তভাবে মাথায় জড়ানো, দুই-একটা চূর্ণকুন্তল কপালে ঝুলিয়া পড়িয়াছে ; চোখে তাহার শান্ত উদাস দৃষ্টি। যেন বৈধব্যের অলৌকিক ঐশ্বর্য তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া মূর্তিমতী হইয়াছে। সে মুখের পানে চাহিলেই চক্ষু আপনিই যেন তাহার পদপ্রান্তে নামিয়া আসে।'

দুটিই বর্ণনামূলক অংশ কিন্তু কী অসামান্য ভাষার সংযম ও গাম্ভীর্য। সাধু ভাষারীতির কী অন্তর্নিহিত প্রসাদগুণ! শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের মত নারীর রূপবর্ণনায় অল্পই উচ্ছ্বসিত হয়েছেন কিন্তু যেখানে রূপবর্ণনা করেছেন সেখানে তাঁর পাকা তুলিকাপাতের নৈপুণ্য কোনমতেই ভুল করবার যো থাকে না। শরৎচন্দ্রের রূপতান্ত্রিকের দৃষ্টি নয়, তিনি কবি নন। মানুষের মন নিয়ে তাঁর কারবার। চরিত্রগুলির মনের গহনে সন্ধানী শিল্পদৃষ্টির আলো ফেলাতেই তাঁর সমধিক আনন্দ। কিন্তু বহির্মুখী বর্ণনাতেও তিনি কম যান না। তিনি শ্রীকান্ত উপন্যাসের গোড়ার দিকে বিনয় করে বলেছেন প্রকৃতিচিত্রণ তাঁর আসে না। কিন্তু ইচ্ছা করলে প্রকৃতি বর্ণনায়ও যে তিনি কত দুর্ধর্ষ হতে পারেন তার পরিচয় পাওয়া যায় ইন্দ্রনাথের নিশীথকালীন গঙ্গা-অভিযানের দৃশ্য বর্ণনার ভিতর কিংবা শ্রীকান্তের একা দ্বিপ্রহর রাত্রে শ্মশান অভিযানের

বিবরণের ভিতর। অথবা শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বের সামুদ্রিক ঝড়ের দৃশ্যে। কিন্তু রূপ বর্ণনা বা প্রকৃতি বর্ণনা এ সবে তিনি সময়ক্ষেপ করেননি কেননা, উপন্যাসিকের প্রধান উপজীব্য মানুষ, প্রধান কাজ মানুষের সু ও কু মণ্ডিত আলোছায়া ঘেরা জটিল সত্তার উন্মোচন। শরৎচন্দ্র নিজেই এক জায়গায় বলেছেন: "রূপের বর্ণনা, স্বভাবের বর্ণনা আমার বইয়ের মধ্যে প্রায় নেই। ও আমি দু-এক কথায় সেরে দিই, বেশি নজর দিই না। আসল বস্তু, তার সত্তা বা মন যাই বলুন—সেটা মানুষের ভিতরটা।" ওই মানুষের ভিতরটাই উদ্ঘাটনের কাজ শরৎচন্দ্র বিধিমতে এবং সার্থকভাবে নিষ্পন্ন করে গিয়েছেন তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলির মধ্য দিয়ে। তাঁর স্টাইল এ কাজে তাঁর প্রধান সহায় হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, শরৎচন্দ্রের স্টাইল আর শরৎচন্দ্রের মানব-মুখীনতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটির কথা ভাবা যায় না।

॥ ৪ ॥

সাহিত্য চিন্তা

বাংলা ভাষার প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন সুগঠিত প্রণালীবদ্ধ সাহিত্যদর্শন ছিল কিনা জোর করে বলা মুশকিল; তবে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটগল্পের ইতস্ততঃ-ছড়ানো মন্তব্য, অন্তরঙ্গজনদের কাছে লেখা চিঠিপত্র এবং সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধ নিবন্ধের অভিমত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাঁর যে মনের প্রকাশ ঘটেছে তার থেকে বোধকরি একটা ধরাছোঁয়া যায় এমন সাহিত্যচিন্তার আদল খাড়া করা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্রের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সর্বপ্রথমে যেটা লক্ষ্য করবার, তিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যের আদর্শে তেমন বিশ্বাসী ছিলেন না। সাহিত্য কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য এবং সে সৌন্দর্যসৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য পাঠককে আনন্দ দান—এই নন্দনবাদী তত্ত্বে তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল বলে মনে হয় না। যদিও হৃদয়ধর্ম তাঁর খুবই প্রবল ছিল তবু সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে, সমসাময়িক কালের ভাবনা-ধারণার আধারে, সাহিত্য পরিবেশনের যে মননশীল আদর্শ ক্রমেই সাহিত্যসংসারে উত্তরোত্তর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, তিনি সেই আদর্শেরই অনুগামী ছিলেন এরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত। অন্ততঃ তাঁর রচনার বিষয়বস্তু, চিত্র-চরিত্রের গড়ন এবং বক্তব্যের ধাঁচ থেকে সে কথাই বারে বারে মনে হয়। তাঁর কথা ছিলঃ "সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে তার ভিতরের বাসনার কামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য।"

অর্থাৎ সাহিত্য শিল্পের কলাকৈবল্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর মনের উপর কোন সময়েই তেমন ছাপ ফেলতে পারেনি, যেমনটা পেরেছে সমাজসচেতন সাহিত্যের ভাবাদর্শ। এই দিক দিয়ে শরৎচন্দ্র ছিলেন আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের একজন সার্থক উত্তরাধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মিল ছিল সামান্যই, কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে তাঁদের দুজনার মধ্যে সাদৃশ্য ছিল যে, দুজনার কেউই সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সংরচনের কথা চিন্তাও করতে পারেননি—সমাজ বারংবার তাঁদের লেখায় ফিরে এসেছে।

দৃশ কিন্তু শরৎচন্দ্র সাহিত্যের এই সমাজসম্পৃক্ত মননশীল আদর্শের অনুগামী

হলেও, যাকে আজকের দিনের পরিভাষায় বলে মননশীল লেখক, তা তিনি বোধহয় ছিলেন না। গোড়াতেই বলেছি, তাঁর ভিতর হৃদয়ধর্মের অতিশয় প্রাবল্য ছিল ; ভাবাবেগের প্রাচুর্য ও সাধারণ স্তরের বাঙালী জীবনের প্রতি অন্তহীন দরদ প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁর মননশীলতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে পল্লীবাসী মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের ঘরকন্নার ছবি যখনই তিনি ফোটাতে গেছেন তখনই তাঁর সমাজসচেতন বুদ্ধিবাদী স্বরূপকে আড়াল করে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পরদুঃখকাতর অসামান্যসংবেদনশীল মানবিক সত্তা। শরৎচন্দ্রের শিল্পী জীবনের এ এক আশ্চর্য দ্বৈধতা যে, তিনি হতে চেয়েছেন মননশীল লেখক কিন্তু হৃদয়বৃত্তির আধিক্যের জন্য বারে বারে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা পরাহত হয়েছে। এতবড় হৃদয়সম্পদে ধনী লেখক আমাদের ভাষায় কমই আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর এই হৃদয়ৈশ্বর্য একই কালে তাঁর দোষ ও গুণের হেতু হয়েছে। দোষের, এই কারণে যে, ঠিক এইজন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাগাল ধরতে পারেননি ; গুণের, যেহেতু ঠিক এই অন্তহীন সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্যতার কারণেই তিনি শিক্ষার স্তরভেদ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বাঙালী পাঠকের চিত্তজয়ী হয়েছেন। এমনভাবে বঙ্কিম-রবীন্দ্রসাহিত্য বাঙালীর মন কাড়তে পারেনি।

শরৎচন্দ্র একজন অসাধারণ মানবিকগুণসমৃদ্ধ কথাসাহিত্যিক। বিদেশের মানবতন্ত্রী কথাকারদের মত (যেমন টলস্টয়, গর্কি প্রমুখ) মানুষই ছিল তাঁর রচনার মুখ্য উপজীব্য। প্রকৃতি বর্ণনায় কিংবা রূপ বর্ণনায় তিনি তেমন উৎসাহ পাননি। মানুষের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। তিনি তাঁর আকৈশোর ভ্রাম্যমাণ বাউণ্ডুলে জীবনে বিচিত্র চরিত্রের নরনারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, জীবনের মন্দ দিকটাও পরখ করে বড় কম দেখেননি। কিন্তু কী আশ্চর্য, এই বিষামৃতময় জীবনের নানাবিধ উল্টা-পাল্টা অভিজ্ঞতা লাভের পরও মানুষে বিশ্বাস তাঁর শিথিল হয়নি, তিনি 'সীনিক' বনে যাননি ; বরং যতদিন বেঁচে ছিলেন, মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসার সঞ্চয়ই তিনি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যের পাত্র থেকে অঝোরে। এ এক অত্যদ্ভুত সংঘটন যে, জীবনের 'অন্ধকার' দিকটার সঙ্গে অত্যন্ত মাখামাখির সম্বন্ধ স্থাপন করার পরও মানবপ্রীতি এমন অক্ষুণ্ণ অবিকৃত রাখতে পারা যায়। অনেকেই তা পারেন না। পাপ যাদের জীবনে আসক্তির স্তর পেরিয়ে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তাদের তো কথাই নেই,

যারা সাময়িক বিভ্রমের বশে স্খলনপতনের পথে পা বাড়ানো সত্ত্বেও কিছুকাল পরেই আবার সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সুস্থ ও স্বস্থ জীবনের ঘাটে ফিরে আসতে সমর্থ হয়, এমনকি তারাও দুর্ভাগ্যক্রমে এই নিষ্কলুষ মানবপ্রীতির স্বর্গ থেকে নির্বাসনদণ্ড বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু আশ্চর্য, শরৎচন্দ্রের গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। হাঁসের পাখায় যেমন জল লাগে না, তেমনি তিনি কী এক দুর্জ্ঞেয় জাদুক্রিয়ার দ্বারা নিজের গা থেকে পরিব্রাজক জীবনের সমস্ত রকম বিরূপ অভিজ্ঞতার মলিন ভস্মরাশি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পুনরায় সংসারাঙ্গনে ফিরে এসেছেন সকলের প্রতি প্রাণঢালা ভালবাসার আবেগ নিয়ে। এই ভাবটাকেই প্রকাশ করেছেন তাঁর এক ভাষণে এই ভাবে ঃ

"নানা অবস্থা বিপর্যয়ে এক দিন নানা ব্যক্তির সংস্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায়নি তা নয়, কিন্তু সেদিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তারা সকল ক্ষতিই আমার পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তাঁরা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়—আমার লেখা কোন দিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা অপরাধ বলে গণ্য করেছেন, এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সবচেয়ে বড় এই অভিযোগ। এ ভাল কি মন্দ আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হয় কিনা এ বিচার করেও দেখিনি, শুধু সেদিন যাকে সত্যি বলে অনুভব করেছিলাম তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি।" (১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে ৫৩তম বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে দেশবাসীর প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর)।

শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীকে লিখিত এক পত্রে শরৎচন্দ্র স্বীয় সাহিত্য জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে ঃ "তোমাদের মত কবিকল্পনা দিয়ে নয়, নিজের জীবনকে ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ করে যে অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেছি, এখন মনে হয়, আমার সাহিত্যেও হয়তো সেইটাই ফুটে উঠেছে বারংবার, আমার জ্ঞাত এবং

অজ্ঞাতসারেও। আর এটা অত্যন্ত অকৃত্রিম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই বোধহয় এত সহজে ছোটবড় সবাইকার কাছে আবেদন পেয়েছে।" (শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, দ্বাদশ সম্ভার, পৃ. ৩৫৩)।

এই দুটি উক্তি থেকে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক স্বরূপের যে-ছবিটি ভেসে ওঠে তা হলো, তিনি বহুদর্শী বহুশ্রুত ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর ওই নানাপথগামী অভিজ্ঞতা-ভূয়িষ্ঠতার পরেও তিনি তাঁর স্বভাবগত মানবপ্রেমকে অব্যাহত ও অমলিন রাখতে পেরেছিলেন। মানুষটি ছিলেন মজ্জাগতভাবে অত্যন্ত সহৃদয় ও করুণাপ্রবণ, নয়তো জীবনের এত এত তিক্ত-মধুর, কটু-কষায় অভিজ্ঞতা লাভের পরেও গ্রামের সাধারণ পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণ কোটরে বদ্ধ আটপৌরে নরনারীর দুঃখ-বেদনায় এমন করে তিনি চোখের জলে আপ্লুত হতে পারতেন না। নিজে কেঁদেছেন, তাঁর পাঠকসাধারণকেও কেঁদে ভাসিয়েছেন। তিনি পতিপ্রাণা বিরাজ-বৌ-এর অবস্থাগতিকে পরপুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগের দুঃখে কেঁদেছেন; বিনাদোষে সরযূর স্বামী পরিত্যক্তা হওয়ার দুঃখে কেঁদেছেন; দরিদ্র ঘরের কন্যা জ্ঞানদার যথেষ্ট বয়স্থা হয়েও অনূঢ়া থাকার দুঃখে কেঁদেছেন; বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিবহনকারিণী বালবিধবা রমার রমেশের প্রতি একান্ত স্বাভাবিক ভালবাসা পল্লীসমাজ-শাসনে অবদমিত ও পরাস্ত হওয়ার দুঃখে কেঁদেছেন; গেঁজেল গুলিখোর জুয়াড়ি স্বামীর সতীসাধ্বী স্ত্রী শুভদার অপরিসীম ক্ষমাপ্রবণতার মাহাত্ম্যের কাছে মাথা নত করেছেন; অভিমানিনী বিন্দুর অপরিমিত সন্তানবাৎসল্যের ক্ষুধার চিত্র এঁকে বন্ধ্যানারীর বেদনার তীব্রতা বুঝিয়েছেন; মায়ের কল্পিত কলঙ্কের দরুন বিনা অপরাধে স্বামীর ঘর করতে না পারার আহত অভিমানে পর্যুদস্তা কুসুমের একদিকে দৃপ্তমর্যাদাবোধ অন্যদিকে সপত্নীপুত্রের প্রতি দুর্নিবার স্নেহের টানের অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি এঁকে সংবেদনশীলা গ্রাম্য নারীর দুঃখের অতলতার বোধ জাগিয়েছেন তাঁর পাঠকের মনে; স্বামী নামক আদর্শের পায়ে সমর্পিতচিত্তা সনাতন ভারতীয় নারীত্বের প্রতীক এক সাধারণ পল্লীবধূর অদ্ভুত সেবাপরায়ণতার আলেখ্য তুলে ধরেছেন গৃহদাহ উপন্যাসের মৃণাল চরিত্রের মধ্যে; ভ্রাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন বৈকুণ্ঠের উইলের গোকুলের মধ্যে; এক অসহায় পরনির্ভর সরল-অন্তঃকরণ গৃহশিক্ষকের প্রতি এক বিধবা ধনী কন্যার জননীতুল্য নিষ্কলঙ্ক স্নেহের আকর্ষণের ছবি ফুটিয়েছেন বড়দিদির মাধবী চরিত্রের ভিতর; এমনি আরও কত চিত্র ও চরিত্র। এরকমটা কখনও সম্ভব হতে পারতো না,

যদি এদের প্রতি লেখক মনেপ্রাণে আন্তরিকতা গুণসম্পন্ন না হতেন, বাংলার গ্রামজীবনের সঙ্গে পরিণত বয়সেও একাত্মতা অটুট না রাখতে পারতেন।

এরকম সচরাচর দেখা যায় না। আমাদের ভুললে চলবে না শরৎচন্দ্র গ্রামের সন্তান হলেও তাঁর জীবনের একটা বড় ভাগ কেটেছে শহরে : বাল্যে ও কৈশোরে ভাগলপুরে, যুবাবস্থার কিছুকাল কলকাতায়, তারপর এক দমকে অনেক কাল রেঙ্গুনে, পরে আবার কলকাতায়। ভালমন্দ বহুবিধ নাগরিক অভিজ্ঞতার তিনি শরিক হয়েছেন জীবনে, তার আভাস পূর্বেই দিয়েছি। রেঙ্গুনে থাকতে বিচিত্র বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন, তাঁর অধীত বিষয়গুলির মধ্যে সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি ছিল প্রধান। তাঁর ভাষার ডৌলটিও ছিল তাঁর অধ্যয়নের ব্যাপ্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুরাপুরি নাগরিক, দরবারী, কিনা sophisticated। তাঁর মাজাঘষা ঝকঝকে স্টাইলের গড়ন থেকেই বোঝা যায় তিনি সচেতন ভাষাশিল্পী ছিলেন, শব্দপ্রয়োগে ছিলেন অতিশয় সতর্ক। অথচ কী আশ্চর্য, নাগরিক মেজাজের এই শিল্পীর মনটি ছিল গ্রামের সুরে বাঁধা। বাংলার পল্লীর প্রতি ভালবাসা তিনি সারা জীবনেও কাটিয়ে উঠতে পারেননি, বাইরের নানাবিধ পালিশ আর পরিমার্জনা সত্ত্বেও অন্তরটি গ্রামেতেই সংলগ্ন ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। সহজাত মানবপ্রেম, ভাবাবেগের প্রাচুর্য, নিজে যে-শ্রেণী থেকে উঠেছিলেন সেই শ্রেণীর জীবনের স্তরের লোকগুলির প্রতি মমত্ব তাঁকে পল্লীজীবনের রূপকার হিসাবেই বিশেষভাবে বাংলা-সাহিত্যে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়ে তাঁর পল্লীভিত্তিক গল্প-উপন্যাসগুলিই যে বেশী উৎরেছে সেটা এইজন্যই অকারণ নয়। পল্লীসমাজ, নিষ্কৃতি, অরক্ষণীয়া, পণ্ডিতমশাই, দেনা-পাওনা প্রভৃতি উপন্যাস এবং মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, একাদশী বৈরাগী, বামুনের মেয়ে, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি প্রভৃতি বড় ও ছোট গল্পগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের মধ্যে পড়ে। তাঁর নগরকেন্দ্রিক উপন্যাস যেমন গৃহদাহ, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত, শেষ প্রশ্ন, পথের দাবী প্রভৃতিতে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য যথেষ্ট, মননজীবিতার পরিচয় স্পষ্ট : কিন্তু রস আর আন্তরিক সংবেদনাই যদি শিল্পসৃষ্টির প্রাণ হয় তাহলে বলতেই হবে যে, প্রথমোক্ত রচনাগুলিই বাঙালী পাঠকের চিত্তে বেশী দাগ কেটেছে। অথচ এই সব রচনার উপকরণ কত সামান্য, চরিত্রগুলি কত সাদামাঠা। মননজীবিতার

মধ্যে জটিলতা থাকে, থাকে খরবুদ্ধি শাণিত চিন্তার স্বাদ—নাগরিক পদ্ধতি-প্রকরণে অভ্যস্ত বিদগ্ধ পাঠকের এই ধরনের জটিল চিত্র-চরিত্রই বেশী ভাল লাগে। তিনি কিরণময়ী কিংবা অচলা কিংবা কমলের চরিত্র অনুধাবন করে যতটা উল্লসিত হন, বিরাজ বৌ কিংবা কুসুম কিংবা রমার চরিত্র অনুধাবন করে স্বভাবতঃই ততটা উল্লসিত হতে পারেন না। অথচ শরৎচন্দ্রের বেলায় দেখা যায়, তাঁর প্রথমোক্ত চরিত্রগুলিকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে শেষোক্ত চরিত্রগুলি সমধিক দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। সারল্যের জয় হয়েছে জটিলতার উপরে, হৃদয়ধর্মের মননশীলতার উপরে, পল্লীপ্রাণতার নাগরিকতার উপরে। শরৎসাহিত্য পাঠ করতে গিয়ে এমনকি মননশীল রচনাদর্শের অনুরাগী পাঠকও মনে মনে এই তথ্য স্বীকার না করে পারেন না।

এই অবিশ্বাস্য সংঘটনের একমাত্র কারণ শরৎচন্দ্রের আন্তরিকতা গুণ। তাঁর অপরিমেয় হৃদয়ৈশ্বর্য এই আন্তরিকতার উৎস থেকেই উচ্ছ্রিত হয়ে এসেছে। পুনরপি বলি, এমন জন্মবৈরাগী বাউণ্ডুলে প্রকৃতির মানুষ কেমন করে মনের গোপনে সাধারণ মানুষের জন্য এত গভীর আন্তরিক প্রেম বাঁচিয়ে রেখেছিলেন সেইটে একটা পরম রহস্যের মত মনে হয়।

মননশীলতার সঙ্গে হৃদয়াবেগের দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্রের শিল্পী জীবনে লেগে ছিলই এবং এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ক্ষেত্রে হৃদয়াবেগ বারবার জয়লাভ করেছে। যে-কারণে তাঁর বুদ্ধিপ্রধান উপন্যাসগুলির কিছু কিছু চরিত্রের বলিষ্ঠতা (যেমন, অভয়া, কিরণময়ী, কমল, সব্যসাচী প্রভৃতি) ও বহু চমকপ্রদ কথায় মনকে নাড়া দেওয়ার আলোড়ন-ক্ষমতা সত্ত্বেও বাঙালী পাঠক কিন্তু সেই সমস্ত রচনাকে তাঁদের সর্বাঙ্গীণ প্রাণের প্রীতি জানায়নি, সর্বাঙ্গীণ প্রীতি জানাতে জানিয়েছে বিরাজ বৌ, নিষ্কৃতি, বড়দিদি, মেজদিদি, দেবদাস, চন্দ্রনাথ, অরক্ষণীয়া, পল্লীসমাজ প্রভৃতি রচনাকেই। অথচ এই রচনাগুলির গঠন অজটিল, কাঠামো একমেটে, চরিত্র পরিকল্পনা একটা বিশেষ পরিচিত ছাঁচ অনুযায়ী। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটিতেই হৃদয়াবেগ খুব প্রবল। যেমন দেবদাস উপন্যাস। এই উপন্যাসটি যতই কাঁচা লেখা আর মেলোড্রামার লক্ষণ চিহ্নিত হোক না কেন, ভাগ্যহত অধঃপতিত দেবদাসের দুঃখে চোখের জল না ফেলেছে এমন পাঠক খুব কমই পাওয়া যাবে। কিংবা চন্দ্রনাথ উপন্যাসের কৈলাস খুড়ো চরিত্র। এই আত্মভোলা স্নেহপরায়ণ চরিত্রটিকে ভাল না বেসেছে এমন পাঠকেরও সাক্ষাৎ মেলা দুষ্কর। শরৎচন্দ্র শুধু যে

নিজেই মানুষকে প্রাণভরে ভাল বেসেছেন তা-ই নয়, অপরকেও তিনি ভালবাসিয়ে ছেড়েছেন।

২

'স্বদেশ ও সাহিত্য' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের কিছু সাহিত্য সম্পর্কিত রচনা (যার বেশীর ভাগই অভিভাষণ আকারে লিখিত) সংকলিত আছে। এই রচনাগুলি এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জনকে লেখা চিঠিপত্রের বয়ান দৃষ্টে মনে হয় সাহিত্যের সঙ্গে নীতির সম্পর্কের প্রশ্নে শরৎচন্দ্রের কিছু সুস্পষ্ট মত ছিল। তিনি মনে করতেন সত্যিকারের ভাল সাহিত্য দুর্নীতির প্রচার কোনমতেই করতে পারে না। নীতিশিক্ষা দেওয়াও তার কাজ নয়। এ বিষয়ে তিনি একবার লিখেছিলেন, "ভাল মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে। হয়ত চিরদিনই থাকিবে। ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ, সেও বলে, মন্দের ওকালতি করিতে কোন সাহিত্যিক কোন দিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। দুর্নীতিও সে প্রচার করে না। একটুখানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক দুর্নীতির মূলে হয়ত এই একটা চেষ্টাই ধরা পড়িবে যে, সে মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।" (শিবপুর ইনস্টিট্যুটে সাহিত্য-সভার সভাপতির অভিভাষণ, ১৩৩০)। অন্য-পক্ষে ১৩৩১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন,···"অতএব যা অসুন্দর, যা immoral, যা অকল্যাণ, কিছুতেই তা art নয়, ধর্ম নয়। Art for art's sake কথাটাও যদি সত্য হয়, তা হলে কিছুতেই তা immoral এবং অকল্যাণকর হতে পারে না, এবং অকল্যাণকর এবং immoral হলে art for art's sake কথাটাও কিছুতে সত্য নয়, শত সহস্র লোকে তুমুল শব্দ করে বললেও সত্য নয়।"

আমি প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছি শরৎচন্দ্র কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাস করতেন না। কেন করতেন না তার মূল উপরের কথাগুলির মধ্যে নিহিত আছে। এই ভাষণেরই অপরাংশে তিনি বলেছেন— "Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে,—এবং অনেক নোংরা জিনিসই ঘটে,—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির বা স্বভাবের

হুবহু নকল করা photography হতে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য? চরিত্র সৃষ্টি কি এতই সহজ?" "দুনিয়ায় যা কিছু সত্যই ঘটে নির্বিচারে তাকেই সাহিত্যের উপকরণ করলে সত্য হতে পারে, কিন্তু সত্য সাহিত্য হয় না।" চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের আয়োজিত সাহিত্য-সভার আলাপচারীতেও তিনি একই কথা বলেছেন—সাহিত্যে দেহবাদের বিরুদ্ধে তাঁর আপসহীন মত প্রচার করেছেন।

এই কথাগুলি আমাদের বর্তমান সাহিত্যের কিছু কিছু অতিপ্রাকৃতবাদী কথাসাহিত্যিক ধীরচিত্তে অনুধাবন করে দেখলে ভাল হয়। বাস্তবের হুবহু অনুকারিতার নামে তাঁরা সাহিত্যসৃষ্টিকে প্রায় আবর্জনার জঞ্জালে পরিণত করে তুলেছেন। তাঁদের লেখায় সাহিত্য ও পোর্নোগ্রাফীর সীমারেখা ঘুচবার উপক্রম হয়েছে। তাঁরা শরৎচন্দ্রের হিতোপদেশে কর্ণপাত করলে আত্মসংশোধনের একটা মস্ত সুযোগ লাভ করে উপকৃত হবেন। জীবনের মলিন দিক শরৎচন্দ্র নিজেও কম দেখেননি, কখনও কখনও তাতে অনুলিপ্ত হয়েছেন, কিন্তু সেই বিসদৃশ প্রভাবের ছাপ তাঁর সাহিত্যে তিনি আদৌ ফেলতে দেননি—এইখানেই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসকে অনেকে তার নামের থেকে সংকেত গ্রহণ করে দুর্নীতিপূর্ণ বলতে চান। এক সময়ে immoral বিবেচনায় এই উপন্যাসটি ভারতবর্ষ পত্রিকার কার্যালয় থেকে ফেরত এসেছিল। শেষে সেটি যমুনায় প্রকাশিত হয়। চরিত্রহীন উপন্যাসের এই তথাকথিত নীতিহীনতা আজকের পরিশীলিত নীতিবোধের মানদণ্ডের বিচারে মোটেই ধোপে টেঁকে না। শরৎচন্দ্র নিজেও এই নিন্দাত্মক কিংবদন্তীর বারবার সজোরে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য—যিনি ভারতবর্ষ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—কে লেখা একাধিক পত্রে শরৎচন্দ্র বিশ্বসাহিত্যের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে অশ্লীলতার অভিযোগের খণ্ডন করতে চেয়েছেন। তিনি খেদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুকে লিখেছেন তাঁদের যদি টলস্টয়ের প্রসিদ্ধ উপন্যাস রিসারেকশন পড়া থাকত তো চরিত্রহীনকে তাঁরা দোষাবহ মনে করতে পারতেন না। তিনি আরও জানিয়েছেন যে তিনি এথিকস-পড়া লোক, নীতিধর্মের মূল কথাগুলি তিনি অন্য কারও চেয়ে কিছু কম জানেন না।

তিনি তাঁর সেই প্রতীতির ভিত্তিতে বলতে পারেন, চরিত্রহীন উপন্যাসের কোন অংশই তিনি দুর্নীতিপূর্ণ করে আঁকেননি। তবু যদি কারও সে রকম মনে হয়ে থাকে তো সেটা তাঁর দুর্ভাগ্য।

শরৎচন্দ্রের এই সকল উক্তির মধ্যে তাঁর মৌলিক সাহিত্যচিন্তার রূপ-রেখার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায়, শ্লীলতা-অশ্লীলতা নীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে তাঁর মত প্রচলিত মতের অনুবর্তী ছিল না। তাঁর বিবেচনায় সেই সাহিত্যই দুর্নীতিপূর্ণ, অশ্লীল, যে-সাহিত্য অকারণে মানুষের রিরংসাবৃত্তিকে উদ্রিক্ত করতে চায় এবং এই অনুচিত পথে পাঠকের মনোযোগ কৃত্রিমভাবে আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হয়। বাস্তব ঘটনার অবিকল অনুকরণ এরূপ একটি পথ। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র তাঁর লেখায় এই পথ বরাবর সযত্নে বর্জন করেছেন।

চরিত্রহীন উপন্যাসের কিরণময়ী আর সাবিত্রী চরিত্র নিয়ে সবচেয়ে বেশী আপত্তি উঠেছিল। কিরণময়ী প্রচলিত নীতিধর্মে অবিশ্বাসিনী, প্রাচীন শাস্ত্রবচনগুলিকে সে কানাকড়িরও মূল্য দেয় না, সতীধর্মের প্রতিও তার তাদৃশ আস্থা আছে বলে বোধ হয় না, অন্ততঃ তার আচরণ সে কথার প্রমাণ দেয় না ; কিন্তু মনে মনে সে পাতিব্রত্যের আদর্শের একান্ত গুণমুগ্ধা ও নিজ জীবনে তার ব্যত্যয় ঘটেছে বলে নিজের উপর বীতশ্রদ্ধা। অন্যদিকে সাবিত্রী একটি মেসের ঝি, তার লম্পট ভগ্নীপতি তাকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুলিয়ে গৃহের বার করে নিয়ে এসেছিল তারপর তাকে ত্যাগ করে। অপরের লুব্ধদৃষ্টি তার উপর পড়েছিল বলে সে নিজেকে অশুচি মনে করে, হয়তো যে-পরিবেশে সে বাস করত সে-পরিবেশে তার পক্ষে পুরাপুরি শুচি জীবনযাপন করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু তার ব্যবহার ছিল অতিশয় ভদ্র সংযত মাধুর্যমণ্ডিত। তার মার্জিত কথাবার্তায় ও অপূর্ব সেবাপরায়ণতায় মুগ্ধ মেসের অন্যতম বাসিন্দা সতীশ তাকে ঝি শ্রেণীর স্ত্রীলোক বলে কখনও ভাবতে পারেনি, সাবিত্রীরও মেসের বাবুদের মধ্যে বিশেষ পক্ষপাত পড়েছিল সতীশের উপর কিন্তু এমনি তার শুচিতা ও পবিত্রতার দিকে নজর যে সে কখনও তার দেহকে অবলম্বন করে সতীশকে নষ্ট হতে দেয়নি বরং সর্বাবস্থায় তাকে সর্বনাশের কবল থেকে আগলে রাখবার চেষ্টা করেছে। সাবিত্রীর চরিত্রমাধুর্যের প্রভাবে পড়ে বেপরোয়াস্বভাব নেশাসক্ত সতীশের জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল।

এই তো হলো এই দুই চরিত্রের স্বভাবের মূল কাঠামো। এর মধ্যে তখনকার কালের সনাতনী সমালোচকের দল নীতিহীনতার কোন্ বিশেষ উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন ভাবতে তাজ্জব লাগে। দুটি নারীরই মূল প্রবণতা প্রেমতন্ময়তার দিকে, পরিবেশের ক্লেদ থেকে উদ্ধার লাভ করে নির্মল হওয়ার দিকে। এমন চরিত্রে কেমন করে নীতিহীনতার কলুষ আরোপ করা যায় ভাল বুঝতে পারা যায় না। কিরণময়ী চরিত্রের পরিকল্পনায়, তার সংস্কারমুক্ত কথাবার্তার ধরনে ও আচরণের ছাঁচে যা-ও বা আপত্তির কারণ থাকতে পারে, সাবিত্রীর বেলায় তেমন আপত্তি আদৌ টেকে না। কিরণময়ী চরিত্রের আপাত-বলিষ্ঠতা, পিলে-চমকানো কথাবার্তা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে লেখক তার অন্তরের শূন্যতাকেই শুধু প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিরণময়ী যে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল সে আর কোন কারণে নয়, সে তার বাইরের বিদ্রোহ আর অশ্রদ্ধাপরায়ণতার সঙ্গে ভিতরের পবিত্রতার অভিলাষের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারলো না বলে। এ ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে রোহিণীর গুলীবদ্ধ হয়ে মরার ঘটনার মত স্থূল বা ক্রূর ঘটনা নয়, এ হলো সেই জাতের ঘটনার দৃষ্টান্ত যাতে বর্ণিত চরিত্র নিজের আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্যের ভারে নিজেই ভেঙে পড়ে। কিরণময়ী তার অসামঞ্জস্য-জনিত tension সহ্য করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে যায়, তার জন্য নীতিশিক্ষক বঙ্কিমের পন্থানুসরণে সামাজিক দাওয়াই প্রয়োগ করে তাকে শাস্তি দেবার তাগিদ শরৎচন্দ্র অনুভব করেননি। এ রকম নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় তাঁর আস্থা ছিল না। বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন তোমরা চরিত্রহীন নিয়ে এত সোরগোল করছ, কিন্তু তোমরা দেখো এর সমাপ্তিটি আমি strictly moral করে আঁকব। এখানে strictly moral কথাটার ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়। শরৎচন্দ্রের অভিলষিত moralityর ধারণায় মানবস্বভাবকে ছাপিয়ে সামাজিক অনুশাসনের প্রবলতার স্থান ছিল না, স্থান ছিল মানবস্বভাবের নিজস্ব নীতিনিয়মকে স্বীকার করে নেবার বলিষ্ঠতা। শরৎচন্দ্র কিরণময়ীর স্বভাবকে অনুসরণ করে তার পরিণাম যেরূপ হওয়া উচিত তা দেখিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মত শাসনদণ্ড উদ্যত করে তাকে শাস্তি দেবার জন্য তাকে পাগল বানাননি। Strictly moral বলতে এখানে তিনি শিল্পের নীতির কথাই বুঝিয়েছেন, সাহিত্যের স্বাধর্ম্যের ইঙ্গিত করেছেন; সামাজিক নীতিশাসনের কৃত্রিমতাকে বোঝাননি। তাকে মূল্য দেওয়া তো আরও পরের কথা।

তাছাড়া এ ব্যাপারে আরও কথা আছে। শরৎ-সাহিত্যের রচনারীতি মনোযোগের সঙ্গে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, যে-কারণে সাহিত্য অশ্লীলতা বা নীতিহীনতার দোষদুষ্ট হয়—বাস্তবের অবিকল অনুকারিতা ও বল্গাহীন বর্ণনা—তার চর্চা থেকে তিনি বরাবর দূরে ছিলেন। নর-নারীর দেহমিলন তিনি দেখিয়েছেন কিন্তু একজন খাঁটি আর্টিস্টের মত সংযত সংকেতের দ্বারাই তিনি সে-প্রয়োজন সাধন করেছেন, আজকের তথাকথিত উগ্র বাস্তববাদী লেখকের মত লেবু-চটকানোর ধরনে মিলন দৃশ্যের বর্ণনার ছন্দ করে ছাড়েননি। অসাধারণ সংযমী লেখক শরৎচন্দ্র। এই ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরী এবং তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ প্রমুখ কতিপয় পরবর্তীকালীন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকের প্রেরণার স্থল। চরিত্রহীন উপন্যাসের কথা হচ্ছিল। এই বইয়ের কোথাও কি এতটুকু ইঙ্গিত আছে যার দ্বারা মনে করতে পারা যায় আসঙ্গলিপ্সার সবিস্তার বর্ণনায় তাঁর সামান্য উৎসাহও পরিলক্ষিত হয়েছে? তবে এ বই চরিত্রহীনতার দোষে কলুষিত হলো কী প্রকারে? এক দেহলোলুপতার ছবি ফোটাবার অবকাশ ছিল রেঙ্গুন অভিমুখী জাহাজের ডেকে কিরণময়ীর প্রতি দিবাকরের সদ্য-জাগ্রত রূপমোহ ও জৈবক্ষুধার বর্ণনাংশে। কিন্তু সেখানেও শব্দের কী অসাধারণ ব্যয়কুণ্ঠা! সবিস্তার বর্ণনের কত অনীহা!

এ বিষয়ে আরও ভাল দৃষ্টান্ত আছে। আমি গৃহদাহ উপন্যাসের অচলা-সুরেশ সম্পর্কের কথা বলছি। ডিহরীতে বাস করা-কালীন এক রাত্রি অচলা-সুরেশের মধ্যে জৈব মিলন সাধিত হয়েছিল। দুয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছায় নয়, ঘটনার দৈব চক্রান্তে। অন্ততঃ অচলার সজ্ঞান ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো বটেই। এই দৃশ্যের কী অপরূপ ব্যঞ্জনাশ্রিত গূঢ় ইঙ্গিতধর্মী বিবরণ শরৎচন্দ্র দিয়েছেন তা গৃহদাহের সংশ্লিষ্ট রচনাংশ তুলে ধরলেই বুঝতে পারা যাবে। গৃহকর্তা রামবাবু অচলাকে সুরেশের শয়নকক্ষের দিকে ঠেলে দিলেন। বৃদ্ধের বারংবার উপরোধ অগ্রাহ্য করতে না পেরে অচলা ধীর পায়ে সুরেশের শয়ন-কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হলো। তারপর কী ঘটলো? শরৎচন্দ্রের বর্ণনা উদ্ধৃত করছি:

"বাহিরে মত্ত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া হাসিয়া উঠিতে লাগিল, সারারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।"

পরদিন অতিশয় ভোরে রামবাবু শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করে দেখতে পেলেন, "বারান্দার এক প্রান্তে টেবিলে মাথা রাখিয়া সুরমা (অচলা) চেয়ারে বসিয়া আছে। 'তুমি যে, এত ভোরে উঠেছ কেন?' সুরমা একবার মাত্র মুখ তুলিয়াই আবার তেমনি করিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিল। তাহার মুখ মড়ার মত শাদা, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা এবং কালো পাথরের গা দিয়া যেমন ঝরণার ধারা নামিয়া আসে, তেমনি দুই চোখের কোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

"বৃদ্ধ শুধু একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া একদৃষ্টে এই অর্ধমৃত নারী-দেহের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথাই তাঁহার কণ্ঠ ভেদিয়া বাহির হইতে পারিল না।"

কয়েকটি মাত্র কথার আঁচড়, কিন্তু কোন কথাই কি ব্যক্ত হতে বাকী আছে? "বাহিরে মত্ত প্রকৃতি" ভিতরের মত্ততার প্রতিরূপক, অচলার মড়ার মত শাদা মুখ, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা ও কালো পাথরের গা থেকে ঝরণাধারার নেমে আসার মত দুই চোখে অশ্রুর প্লাবন, তার "অর্ধমৃত নারী-দেহ", কোন সংবাদই অকথিত রাখেনি। পরপুরুষের সঙ্গে এই অবাঞ্ছিত অবৈধ মিলনে ভারতীয় নারীর সনাতন সংস্কার ও মজ্জাগত পাতিব্রত্যের আদর্শ কী সাংঘাতিকভাবে বিমর্দিত হয়েছে, সূক্ষ্ম সাংকেতিকতা-ময় শব্দগুলির মধ্য দিয়ে তারই কিছুটা আভাসে প্রকাশ পেয়েছে। শরৎচন্দ্র যে কত বড় শিল্পী ও তাঁর সাহিত্যভাবনা কত সুস্থ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এই অংশটির চিত্রণে তার অসংশয় পরিচয় তিনি রেখেছেন। আমাদের একালীন কথাকারদের মধ্যে যাঁরা দেহমিলনের বর্ণনায় ন্যূনতম সুযোগ পেলেও সেই সুযোগ ছাড়েন না এবং খুঁটিনাটি সমেত তার ষোলকাহন বর্ণনাদানে মেতে ওঠেন, তাঁদের শরৎচন্দ্রের উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং সেইভাবে নিজেদের রচনাকে পরিশোধিত করা উচিত।

৩

বাংলা সাহিত্য জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানেন সাহিত্যের রীতি ও নীতি নিয়ে এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের পক্ষ নিয়ে কিছু প্রবীণ ও নবীন লেখক বিতর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

শেষোক্তদের মধ্যে শরৎচন্দ্র ছিলেন অন্যতম। ঘটনাটি এই : ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসের বিচিত্রা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের ধর্ম' নামক এক প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি তৎকালীন তরুণ সাহিত্যিকদের (কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি গোষ্ঠীর লেখকদের) লেখনীর অসংযমকে কটাক্ষ করে কিছু অকরুণ মন্তব্য করেন। পরের মাসের বিচিত্রায় এই প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ ও সংশ্লিষ্ট তরুণ লেখকদের পক্ষ সমর্থন করে ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত একটি জোরালো প্রবন্ধ প্রচার করেন। একে একে এই বিতর্কে যোগ দেন দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, শরৎচন্দ্র এবং আরও কেউ কেউ। শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ওই বছরের আশ্বিন মাসের বঙ্গবাণী পত্রিকায়। প্রবন্ধটির নাম 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি'। তাতে তিনি তরুণ লেখকদের পক্ষ অবলম্বন করে কবিগুরুর উদ্দেশে বেশ কিছু চোখা-চোখা বাণ নিক্ষেপ করেন। তরুণ লেখকদের প্রতি, তারুণ্যের প্রতি, তারুণ্যের সৃষ্টিক্ষমতার প্রতি শরৎচন্দ্রের গভীর বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি স্থির থাকতে পারেননি। তরুণদের প্রতি মমতার বশে কবির সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর নিজের সাহিত্য ছিল সংযমের পরাকাষ্ঠা কিন্তু যাঁদের হয়ে তিনি সওয়াল করতে নেমেছিলেন তাঁদের অনেকের রচনা সম্পর্কে কিন্তু সে কথা বলা যায় না।' তরুণ লেখকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই যে সে সময় জেনেশুনে "বেআব্রুতার" ব্যসনে মেতেছিলেন সে কথা আজ ইতিহাসের সত্যে পরিণত। কবির অভিযোগের বাস্তব ভিত্তি ছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্র অভিযোগটিকে উড়িয়ে দেবার আগ্রহে কবির বিরুদ্ধে কিছু অতিরিক্ত ঝাঁঝ প্রকাশ করে ফেলে-ছিলেন। তীব্র তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো লেখার নমুনা হিসাবে বিতর্কমূলক প্রবন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের ওই লেখাটি দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু শরৎচন্দ্র পরে স্বীকার করেছিলেন যে, কবির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার সময় তাঁর নিজের বক্তব্যের অনুকূলে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি—স্বল্প-পরিমাণ নজিরের ভিত্তিতে তিনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ওই সময়ের পরে এক বৎসরকাল যাবৎ তিনি তরুণদের লেখা বই-পত্র বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়েন। পড়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কবিগুরুর সমালোচনায় যথেষ্ট সারবত্তা ছিল। এই অকপট স্বীকারোক্তির পরিচয় আছে তাঁর ১৩৩৬ সালের

আশ্বিন সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত একটি অভিভাষণের বয়ানের মধ্যে। শরৎচন্দ্র যে কতখানি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া এই স্বতঃপ্রবৃত্ত কবুলনামার মধ্যে। তরুণ লেখকদের উদ্দেশ করে তিনি এই ভাষণে বলেছেন: "তোমরা যারা এখানে আছ, রাগ করে আমার কথা নিও না। এ সব আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলেছি। বহুদিন সাহিত্য চর্চা করে যা ভাল বুঝেছি তার থেকেই বলছি, সংযত হওয়া দরকার। তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ—একটু আধটু করেছ তা নয়, অনেকখানি করেছ। একটু আধটুর জায়গায় কোথাও কিছু হতো না। এ ক্ষেত্রে তা একেবারে নয়।"

কিন্তু মাত্র এই স্বীকারোক্তির জন্যই প্রবন্ধটি মূল্যবান নয়, এতে আরও এমন কিছু কথা আছে যা নবীন-প্রবীণ সকলেরই আমাদের বিশেষ প্রণিধান করা উচিত। ভারতীয় সমাজের শাস্ত্রশাসিত বিশেষ গড়নের জন্য, অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য, এদেশে যৌন অবদমনের সমস্যা একটি বাস্তব সমস্যা। এই কারণেই এদেশীয় তরুণ লেখকদের দৃষ্টি এই বিষয়টার দিকে বেশী করে আকৃষ্ট হয়। তাঁরা যেন আর কোন বিষয়বস্তু চোখেই দেখতে পান না। শরৎচন্দ্র এই একাঙ্গিতার সমালোচনা করে লিখেছেন: "কেবল একটা ব্যাপারে তোমরা বেদনা বোধ করছ।...বেদনার কি আর কোন বস্তু দেখতে পাও না? মানবজীবন, সমস্ত সংসার, এত বড় পরাধীন জাতি, এসব ত রয়েছে, এর বেদনা কি তোমরা অনুভব কর না? আমরা সব চাইতে দরিদ্র, আমাদের মধ্যে শিক্ষার কত অভাব, সামাজিক ব্যাপারে কত ত্রুটি আছে, এসব নিয়ে তোমরা কাজ কর না কেন? এর অভাব, বেদনাটি তোমাদের লাগে না? এর জন্য প্রাণটা কাঁদে না কি? তোমাদের সাহস আছে, কিন্তু সাহস কেবল একদিকে যৌনচিত্রণের দিকে হলে চলবে না। যেটাকে তোমরা সাহস মনে করছ, আমি মনে করি, সেটা সাহসের অভাব। এদিকে ত শাস্তির ভয় নাই, কেউ তোমাদের বিশেষ কিছু করতে পারবে না। যেদিকে শাস্তির ভয় আছে, সেদিকে সত্যসত্যই সাহসের দরকার। সেখানে তোমরা নীরব। লেখার শক্তি তোমাদের আছে স্বীকার করি; কিন্তু অন্য জিনিস তোমরা ধরলে না। পরাধীন দেশের কত রকম অভাব আছে—নানা দিকে আছে—এটা যেন তোমরা একেবারেই অস্বীকার করে চলছ।"

শরৎচন্দ্র একেবারে মোক্ষম জায়গায় হস্তস্পর্শ করেছেন। আজও নবীন লেখকদের একটা মোটা ভাগ যৌনতার সমস্যা নিয়েই বুঁদ হয়ে আছেন, রাষ্ট্র সমাজ ও দেশের যে আরও বহুতর সমস্যা আছে তা তাঁদের কল্পনাকে মোটেই উচ্চকিত করে না। তাঁদের জিজ্ঞাসার বিস্তৃতির অভাব ও কেবলমাত্র একটি বিষয়ের উপরেই অন্তহীন দাগা বুলনোর অভ্যাস যে বাংলা সাহিত্যের গণ্ডীকে নিতান্ত সংকীর্ণ সীমায় সীমিত করে রেখেছে সে তাঁরা দেখেও দেখছেন না। Sex জীবনের অনেকগুলি বিষয়ের একটি বিষয় মাত্র ; সেইটাই জীবন নয়। তাকে ছাপিয়ে যাওয়ার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা। শরৎ সাহিত্য থেকে যদি কিছু শিক্ষণীয় থাকে তো এই শিক্ষাই আমরা পাই।

॥ ৫ ॥

সমাজ-চেতনা

শরৎ সাহিত্য পূর্বাপর অনুধাবন করলে তার মধ্যে চিন্তার কিছু দ্বৈধতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তির স্তরে, তিনি ব্যক্তিমুক্তির একজন প্রবল উদ্‌গাতা; পরিবারের স্তরে, বেশ কিছু পরিমাণে রক্ষণশীল; আর ব্যক্তি ও পরিবার নিয়ে গঠিত যে সমাজ, তার পরিপ্রেক্ষিতে কখনও স্বাধীনতার অনুরাগী কখনও রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী। সমাজের প্রসঙ্গে কখনও তিনি ভাঙনের জয়গান করেছেন, বিদ্রোহের মন্ত্রণা দিচ্ছেন, কখনও আবার একেবারে বিপরীত প্রান্তে চলে গিয়ে প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর সংহতি রক্ষার প্রয়োজনীতার উপর জোর দিচ্ছেন। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে, শরৎ সাহিত্যের পরিবেশিত ভাবধারায় পূর্বাপর সামঞ্জস্য নেই—এক সময়ের ভাবনা অন্য সময়ের ভাবনার দ্বারা খণ্ডিত, এক বইয়ের বক্তব্য অন্য বইয়ে বক্তব্যে অস্বীকৃত।

অবশ্য এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কোন বড় লেখকের মনোজীবনই একটা সোজা সরল রেখায় অগ্রসর হয় না। তার চলার পথে বাঁক থাকে, বাঁক কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে মোড় নেয়; কখনও আবার পথ সম্পূর্ণ উল্টোমুখে ঘুরে যায়। এই অসামঞ্জস্য বা স্বতো-বিরোধ লেখককে ছোট করে না বরং শিল্পীর মানসিকতা যে প্রায়শঃ খুবই জটিলতামণ্ডিত এবং বহু পরস্পর-বিরোধিতার আধারস্থল—সেই সত্যেরই জানান দিয়ে যায় মাত্র। চিন্তার অসামঞ্জস্যহীন সরল গতি মাঝারি মাপের শিল্পীর লক্ষণ, মহৎ শিল্পীর ব্যক্তিত্বের বিবর্তনের ছকের ভিতর কিছু না কিছু আত্মখণ্ডন থাকবেই। কন্ট্রাডিক্‌শন মহৎ মনের ধর্ম—এরূপ কথাও, এমনকি, কেউ কেউ বলেছেন।

শরৎ সাহিত্যের এই যে দ্বৈধতা, স্বতোবিরোধ, এর একাধিক কারণ নিশ্চয়ই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোয় নিরূপণ করা সম্ভব; তবে মনে হয় চেষ্টা করলে শরৎচন্দ্রের জীবনীর ছক থেকেই এমনতর অসামঞ্জস্যের কিছু হেতুভূত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। শরৎচন্দ্র হুগলী

জেলার এক নির্বিত্ত কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাঢ়দেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণের বহু অন্ধ সংস্কার তাঁর মজ্জার মধ্যে ছিল। এ তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেননি। যেমন উপবীতের মহিমায় বিশ্বাস, ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলার সার্থকতায় বিশ্বাস, সন্ধ্যাহ্নিক পূজা-আর্চা, স্বপাক আহার, স্বপাক আহারের অভাবস্থলে কেবলমাত্র স্বজাতির প্রস্তুত আহার গ্রহণ দ্বারা দৈহিক ও মানসিক শুচিতা রক্ষার প্রয়াস প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত আচার-প্রথা পালনের সার্থকতায় বিশ্বাস, জাতপাতের ভেদ মেনে চলায় বিশ্বাস, অসবর্ণ বিবাহরীতির প্রতি নিতান্ত কুণ্ঠিত সমর্থন ইত্যাকার নানা নিদর্শনের মধ্যে শরৎচন্দ্রের এই গতানুগতিক সংস্কারানুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিধবার পুনর্বিবাহের যৌক্তিকতায়ও তিনি পুরাপুরি বিশ্বাস করতেন বলে মনে হয় না, কারণ তাঁর এমন একটি বইও নেই যার কাহিনী-বৃত্তের ঘটনা সংস্থাপনের মধ্যে বিধবার পুনরায় বিয়ে দেবার মত মনোবল তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পেরেছেন দেখা যায়। যদিও এরকম ঘটানোর সম্ভাবনা একাধিক গল্প-উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যেই ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পল্লীসমাজের রমা ও রমেশের ভালবাসার উল্লেখ করা যায়। তিনি তাঁর একাধিক ভাষণে ও প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবাদের প্রতি নিষ্করুণতার সমালোচনা করেছেন কিন্তু স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে অধিক উদারতা দেখিয়েছেন তারও কোন প্রমাণ নেই।

যদি বলেন শরৎচন্দ্রের প্রতি আরোপিত এ সকল অভিযোগ আমার মনগড়া কল্পনামাত্র, সেক্ষেত্রে কিছু কিছু উদাহরণের সহযোগে অভিযোগগুলির সারবত্তা প্রতিপাদনের চেষ্টা করতে হয়। পল্লীসমাজের রমা-রমেশের কথা এইমাত্র বলেছি। ছোঁয়াছুঁয়ি তথা আহারের শুচিতা রক্ষা প্রভৃতি সংকীর্ণচিত্ত অভ্যাসগুলির সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনোভাব বোঝাবার জন্য দুটি উপন্যাসের দৃষ্টান্ত নেওয়াই যথেষ্ট—চরিত্রহীন ও পথের দাবী। চরিত্রহীনে সতীশ মদ্যপ, মন্দ বন্ধুর প্ররোচনায় পড়ে অস্থান-কুস্থানে যাওয়ারও তার অভ্যাস আছে; কিন্তু দুবেলা তার নিয়মমাফিক সন্ধ্যাহ্নিক আচমনাদি না করলেই নয়। আর মেসের ঝি সাবিত্রীর তো একটা প্রধান কাজই হলো রোজ সকাল ও সন্ধ্যায় সতীশবাবুর সন্ধ্যাহ্নিকের জায়গা নিকানো, পূজার আসন, কোশাকুশি আর গঙ্গাজল এগিয়ে দেওয়া। এত আচারনিষ্ঠার বাড়াবাড়ি এক এক সময় আধিখ্যেতা বলে মনে হয়।

বলা হবে সতীশের চরিত্রকে নিখুঁতভাবে আঁকবার জন্য ব্যক্তিত্বের এই দিকটাকে দেখানোর প্রয়োজন ছিল; কিন্তু এই যুক্তির উত্তরে বলব যে, লেখকের নিজের আচার-মনস্কতাই এই ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণিত চরিত্রের উপর প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, নয়তো এতদূর বাড়াবাড়ি কখনও সম্ভব হতে পারতো না।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক করে পথের দাবী উপন্যাসের অপূর্ব চরিত্রটি। হালদার বংশীয় এই যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি—কলকাতা থেকে জীবিকার প্রয়োজনে সে তথাকথিত ম্লেচ্ছের দেশ বর্মা মুলুকে এসেছে বোথা কোম্পানীর চাকরি নিয়ে। কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ির শুচিবাই তার আর কিছুতে ঘুচতে চায় না। আচার-বিচারের খুঁতখুঁতেপনায় বাংলার শুচিবায়ুগ্রস্ত বিধবাকেও সে হার মানায়। সে নাকি অত্যন্ত মাতৃভক্ত সন্তান, পাছে মায়ের প্রাণে ব্যথা লাগে সেই কারণে এই দূর দেশে এসেও সে আহারে-বিহারে ব্রাহ্মণোচিত আচার-পরায়ণতা রক্ষায় সতত সচেষ্ট। শুচিতার পানটি থেকে চুণটি পর্যন্ত খসবার যো নেই এমনি তার সতর্কতা! মা ছেলেকে প্রাণ ধরে বর্মা মুলুকে আসতে দেবার সময় পরিবারের অত্যন্ত বিশ্বাসী পাচক ঠাকুর তেওয়ারীকে সঙ্গে দিয়েছেন তাই রক্ষা নতুবা অপূর্বর হয়তো এই ম্লেচ্ছের দেশে আসাই হতো না। তেওয়ারী মায়ের বকলমে অপূর্বকে সতত আগলে রাখে, আর অপূর্ব তেওয়ারীর বকলমে অকুস্থলে অনুপস্থিত মায়ের কাছে তার নিভাঁজ শুচিতার নিত্য পরীক্ষা দেয়। এইভাবে প্রভু ও ভৃত্য দুইয়ে মিলে রেঙ্গুন শহরের বুকের উপর হিন্দুয়ানীর এক দুর্ভেদ্য দুর্গ খাড়া করে তুলেছে। অপূর্ব ক্রীশ্চানের মেয়ে ভারতীকে মনে মনে ভালবাসে কিন্তু তার হাতে খেতে-ছুঁতে তার প্রবল আপত্তি। সে সরকার মশাইয়ের পরিচালিত ব্রাহ্মণ হোটেলের কদন্ন খাবে তবু ভারতীর সযত্নে প্রস্তুত আহার্য মুখে তুলবে না। আচারের এই গোঁড়ামির চিত্র পথের দাবী উপন্যাসের গোড়ার দিকের অনেকগুলি পৃষ্ঠা এমন জুড়ে আছে যে, ওই এককালীন রাজরোষনিগৃহীত প্রসিদ্ধ উপন্যাসের বৈপ্লবিকতার স্বাদ তার ফলে অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে বললেও চলে। অথচ এ জিনিস এ বইয়ের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না, শুধু শরৎচন্দ্রের অতিরিক্ত আচার-বিচারের 'বাই'—ব্রাহ্মণত্বাভিমান—কাহিনীর ধারার ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এই বিভ্রাটের সৃষ্টি করেছে। ছোঁয়াছুঁয়ির প্রসঙ্গ বিপ্রদাস উপন্যাসেও বড় কম

নেই। শরৎ সাহিত্যে প্রসঙ্গটির উপর্যুপরি অবতারণা পৌনঃপুনিকতার এক-ঘেয়েমিতে রূপান্তরিত হয়েছে বললে অন্যায় বলা হয় না।

স্বপাক আহারের মহিমা উদঘোষিত হয়েছে গৃহদাহ উপন্যাসের ডিহরী প্রবাসী সদাশয় বৃদ্ধ বাঙালী ব্রাহ্মণ রামচরণ লাহিড়ীর চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়ে। তিনি সচরাচর নিজে রেঁধে খেতেই অভ্যস্ত, পারতপক্ষে অন্যের রান্না ছোঁন না। ব্রাহ্মদের প্রতি রামবাবুর বিতৃষ্ণার অন্ত নেই (এই বিতৃষ্ণা কতকটা শরৎচন্দ্রের নিজেরও ছিল, দত্তা উপন্যাসের রাসবিহারী চরিত্র আর গৃহদাহের কেদারবাবু চরিত্র তার প্রমাণ। এখানেও লেখকের অনীহা তাঁর সৃষ্ট এই দুই চরিত্রে প্রযুক্ত হয়েছে বললে অন্যায় হয় না।); তারা হিন্দু সমাজের গণ্ডী ত্যাগ করে নিজেরা একটা আলাদা সমাজ গড়ে তুলেছে বলে তাদের তিনি মনে মনে কোনদিনই ক্ষমা করতে পারেননি। কিন্তু গৃহদাহের উপসংহারভাগে দেখা যায় রামবাবুর আত্যন্তিক 'স্বজাতিপ্রীতি' আর আচারনিষ্ঠার দুর্গপ্রাকার শেষ অবধি তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছে। এইখানে আর শরৎচন্দ্র সংস্কারচালিত লেখক নন, বরং সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সমাজপ্রবাহ লক্ষ্য করার শিল্পীজনোচিত প্রকৃত শক্তিমত্তাই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। রক্ষণশীলতার উপরে এখানে প্রগতির জয় হয়েছে। বিষয়টির আলোচনা এই প্রবন্ধেই পরে আরও করার অবকাশ হবে, সুতরাং এখানে প্রসঙ্গটিতে দাঁড়ি টানি।

কিন্তু কৌলিক সংস্কারের ঊর্ধ্বে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের আর একটি দিক ছিল, যেখানে তিনি বিস্ময়কররূপে স্বাধীন, মুক্ত প্রকৃতির মানুষ। তাঁর ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই তাঁর এই মুক্তমনা স্বরূপের কারণ। চন্দননগরে প্রবর্তক সঙ্ঘের আহূত আলাপসভায় (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) আলাপচারীর প্রসঙ্গে তিনি তাঁর প্রথম জীবনের এই দিকটির একটি অকপট আভাস দিয়েছিলেন এইভাবে: "অভিজ্ঞতা না থাকলে ভাল কিছুই লেখা যায় না। অভিজ্ঞতা লাভের জন্য অনেক কিছুই করতে হয়। অতি ভদ্র শান্তশিষ্ট জীবন হবে, আর সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ হবে—তা হয় না। বলেছি— ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক—আমাকেও চার পাঁচবার সন্ন্যাসী হতে হয়েছিল। ভাল ভাল সন্ন্যাসীরা যা করেন সবই করেছি। গাঁজা মালপো কিছুই বাদ যায়নি।······বিশ বছর এইটাতে গেল। এই সময় খানকতক বই লিখে ফেললুম। 'দেবদাস' প্রভৃতি ঐ আঠার-কুড়ির মধ্যে লেখা। তারপর গান

বাজনা শিখতে লাগলুম। পাঁচ বছর এতে গেল। তারপর পেটের দায়ে চলে গেলাম নানা দিকে। প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা তাই থেকে। এমন অনেক কিছু করতে হত যাকে ঠিক ভাল বলা যায় না। তবে সুকৃতি ছিল, ওর মধ্যে একেবারে ডুবে পড়িনি। দেখতে থাকতাম, সমস্ত খুঁটিনাটি খুঁজে বেড়াতাম। অভিজ্ঞতা জমা হত। সমস্ত islandগুলা (বর্মা, জাভা, বোর্ণিয়ো) ঘুরে বেড়াতাম। সেখানকার লোক অধিকাংশ ভাল নয়—smugglers. এইসব অভিজ্ঞতার ফল— 'পথের দাবী'। বাড়িতে বসে আর্মচেয়ারে বসে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না, অনুকরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সত্যিকার মানুষ না দেখলে সাহিত্য হয় না।··· মানুষ কি, তা মানুষ না দেখলে বোঝা যায় না। অতি কুৎসিত নোংরামির ভিতরও এত মনুষ্যত্ব দেখেছি যা কল্পনা করা যায় না।"

উদ্ধৃতিটি একটু বিস্তৃত হয়ে গেল। কিন্তু সেটা অকারণে নয়। উদ্ধৃতির বিস্তারের মধ্যে লেখকের জীবনের যে রূপরেখাটি পাওয়া গেল তা আমাদের সচরাচর প্রচলিত বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের ছাঁচের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। এর জাত-গোত্রই আলাদা। এই জীবনীর ছাঁচ সম্পূর্ণ unconventional —গতানুগতিকত্বরহিত। শুধু unconventional বললে সবটুকু বলা হয় না, বলা উচিত বৈপ্লবিক। যে-মানুষ জীবনের চলার পথে সুন্দর-কুৎসিত কালো-ধলো জটিল-অজটিল নানা বিচিত্র বহুমুখী অভিজ্ঞতার উজান ঠেলে এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে তার গায়ে কি আর কৌলিক সংস্কার পুরাপুরি সংলগ্ন থাকতে পারে? তার জীবনযাপনের ধরনই তো তাকে বংশগতির প্রভাব থেকে মুক্ত করবার সবচেয়ে বড় সহায়ক। শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনীর স্তরে প্রকৃত আর্টিস্টের জীবনযাপন করে গেছেন, আর বলাই বাহুল্য, আর্টিস্টের জীবনে কৌলিক সংস্কারের লেশ বড় একটা অবশিষ্ট থাকে না, থাকলেও সর্বসংস্কারমুক্তির আবেগের তলায় চাপা পড়ে নিতান্ত পিষ্ট হয়ে পড়ে।

তবু যে শরৎচন্দ্রের সত্তায় ব্রাহ্মণত্বের অভিমান ঘুচেও ঘুচতে চায়নি, সে এই হেতু যে, তিনি সমস্ত বিবর্তন-পরিবর্তনের মধ্যেও এটিকে সজ্ঞানে সযত্নে লালন করেছেন। কতকটা তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবনের প্রতি মমত্ববশতঃ, কতকটা রাঢ়দেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণের মজ্জাগত অনুদারতার জন্য। কথাটা খানিকটা প্রাদেশিক শোনালেও আমি বলতে বাধ্য যে, এই ব্রাহ্মণের মনো-গঠনের ভিতর অন্ধ আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্তি, ছোঁয়াছুঁয়ি জাত-বিচারের প্রবণতা, পুরাতন রীতিনীতিকে আঁকড়ে থাকবার মোহ প্রভৃতি যুক্তিহীন মনো-

বৃত্তি প্রায় দিনের সঙ্গে রাত্রি, আলোর সঙ্গে অন্ধকার অচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন থাকবার মত উচ্চশিক্ষা আর সাংস্কৃতিক পালিশ সত্ত্বেও অস্তিত্বের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে লেপ্টে আছে। এই কারণেই শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের ভিতর এক অদ্ভুত দ্বৈধতার সমাবেশ দেখতে পাই।--তিনি বাস্তব জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতার দৌলতে একজন সর্বসংস্কারমুক্ত পুরুষ, পক্ষান্তরে কৌলিক স্তরে সংস্কারের হাতে-ধরা বশংবদ প্রকৃতির এক জীব। নয়তো এমন অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ব্যাপার কী করে সম্ভব হয় যে, যিনি বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবী ঐতিহ্যের অনুসরণে অভয়া, কিরণময়ী, সব্যসাচী, কমলের মত অবিস্মরণীয় সব চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন, বিদ্রোহের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছেন তাদের কর্ম ও কথার মধ্যে দিয়ে, তিনিই আবার তাঁর এক স্নেহের ভগিনীর কাছে এই অকপট স্বীকারোক্তি করেছেন যে, "দিদি, আমি কোন কালে খাওয়া ছোঁওয়ার বাছবিচার করিনে, কিন্তু মেয়েদের হাতে আমি কোনদিন কিছু খাইনে। শুধু খাই তাঁদের হাতে যাঁদের বাপ মা দুজনেই ব্রাহ্মণ এবং বিয়েও হয়েছে ব্রাহ্মণের সঙ্গে।··· সমাজভুক্ত হোন তাতে আসে যায় না, কিন্তু ঐ রকম মেশানো জাত হলে আমি তাঁদের ছোঁয়া খাইনে। তারা বলে শরৎবাবু শুধু লেখেন বড় বড় কথা, কিন্তু বাস্তবিক তিনি ভারি গোঁড়া। আমি গোঁড়া নই লীলা, কিন্তু শুধু রাগ করেই এদের হাতে খাইনে।" (শ্রীযুক্তা লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের অংশ)।

এই স্বীকারোক্তিমূলক পত্রাংশ থেকে দুটি জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। এক, মুখে অস্বীকার করলেও তিনি খাওয়া-ছোঁওয়ার বাছবিচার মানতেন। বাছবিচারের বেলায় ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাত ছিল। দুই, কোন একটি বিশেষ সমাজভুক্ত মেয়েদের প্রতি তাঁর অন্তরের বিরাগ ছিল। শ্রীযুক্তা গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত সংশ্লিষ্ট চিঠি ও অন্যান্য চিঠি (শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, ত্রয়োদশ সম্ভার দ্রষ্টব্য) পর্যালোচনা করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তিনি এখানে ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের কথাই বলতে চেয়েছেন। একজন বহুদর্শী বহুশ্রুত মানুষের, বিশেষ করে শিল্পী মানুষের, জীবনে এরকম সাম্প্রদায়িক অনুদারতা থাকাটা যে বাঞ্ছনীয় নয় সে কথা শরৎচন্দ্রের মত সংবেদনশীল লেখকের চেয়ে আর বেশী কে জানতেন? তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর এই সংকীর্ণচিত্ত বিরাগকে ভাষা না দিয়ে পারেননি। অতি বড় মহৎ লেখকের জীবনেও যে কত সময় কত কুসংস্কার থাকে এ তারই একটা প্রমাণ। এই নিয়ে আক্ষেপ জানানো চলে, তাই বলে হয়-কে নয় করা যায় না।

আমার মনে হয় শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে যে অফুরন্ত মালমশলা ছিল, যে-সুবিশাল মানবীয় জ্ঞানের পুঁজি ছিল, তাইতে তিনি আরও অনেক বড় লেখক হতে পারতেন, পেতে পারতেন একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মননশীল লেখকরূপে অসংশয় প্রতিষ্ঠা; শুধু তাঁর এই অনুদার প্রাদেশিকতা আর সাম্প্রদায়িকতাই তাঁকে তা হতে দেয়নি, পেতে দেয়নি। কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে এইখানেই তাঁর মৌলিক পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে জীবনারম্ভ করেছিলেন, তারপর প্রতিটি অভিজ্ঞতার অধ্যায়কে সোপান রূপে ব্যবহার করে তাদের ধাপে ধাপে পেরিয়ে, জীবনের শেষ পর্যায়ে যেখানে এসে পৌঁছেছিলেন সেখানে আন্তর্জাতিকতার বিরাট অঙ্গন বিস্তৃত ও তাতে বিশ্বের সর্বজাতির মেলা বসেছে; সেখান থেকে জন্ম-ক্ষেত্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িকে সুদূর নীহারিকালোকের ধূম্রপুঞ্জের মত অস্পষ্ট আভাসে চোখে পড়ে মাত্র, তার বেশী অনুভব করা যায় না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের বেলায় তেমন নয়। তিনি বর্মা জাভা বোর্ণিয়ো ইত্যাদি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি পরিক্রমা করলেও এবং জীবনে বিচিত্র-বিপুল-বিবিধ অভিজ্ঞতার শরিক হয়ে অগুণতি মানুষ চরে খেলেও তাঁর মনের এক কোণায় কিন্তু আমরণ হুগলী জিলার দেবানন্দপুর গ্রাম সংসক্ত হয়ে ছিল। এর পেছুটান তিনি কোন সময়েই কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাই তাঁর মধ্যে এত বৈসাদৃশ্য, এত অসামঞ্জস্য, এত স্ববিরোধ। তাই তিনি পথের দাবীর মত রাজনৈতিক বিপ্লব আর শেষ প্রশ্নের মত সামাজিক বিপ্লবের বাণীবাহক উপন্যাসের স্রষ্টা হয়েও বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্য জীবনের রূপকার, অতুলনীয় পারিবারিক গল্পোপন্যাসের অমর কথাকার। আর কী আশ্চর্য, বাংলার পাঠক তাঁর বৈপ্লবিক রূপটাকে তেমন নেয়নি যেমন নিতে পেরেছে তাঁর এই সাধারণ সুখদুঃখবেদনায় ভরা গৃহসংসারের স্নিগ্ধ-মধুর চিত্রগুলিকে। তবে কি শরৎ-চন্দ্রের সংস্কারমুক্ত বৈপ্লবিকতা নিষ্ফল হয়েছে? তাঁর সংস্কারানুগত গৃহবদ্ধ পারিবারিক শিল্পীর রূপটাই সব ছড়িয়ে বাঙালী পাঠকের চিত্তজয় করেছে?

এই প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দেওয়া সোজা নয়। তবে আর্টের এ এক বিচিত্র খেয়াল যে, অনেক সময় তার বিচারে চূড়ান্ত বিপ্লবও উপেক্ষিত হয়, সে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় গৃহ-সংসারের ছোটখাট সুখ-দুঃখকে আর তাতেই সে সমধিক স্ফূর্তি অনুভব করে। দিগন্তের অভিমুখী বহিরাবেগ অপেক্ষা কূপমণ্ডূকতাই যেন তার বেশী ভাল লাগে, আকাশে হাত বাড়ানো অপেক্ষা

সে যেন গৃহাঙ্গনেই লগ্ন হয়ে থাকতে বেশী পছন্দ করে। সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় ছুটোপাটি খাওয়ায় তার আনন্দ নয়, বাড়ির খিড়কি পুকুরের শান্ত স্থির জলে অবগাহন-স্নানেই তার দেহের আরাম, প্রাণের তৃপ্তি।

শরৎচন্দ্রের শিল্পসৃষ্টিগুলির মূল্যায়ণে অগ্রসর হলে উপরের এই মন্তব্যের সার্থকতাই যেন বেশী চোখে পড়ে। শিল্পের মানদণ্ডে তাঁর বিরাজ-বৌ, পল্লী-সমাজ, অরক্ষণীয়া, নিষ্কৃতি, পণ্ডিতমশাই, বৈকুণ্ঠের উইল প্রভৃতি পল্লীভিত্তিক পারিবারিক উপন্যাসগুলি যতটা উৎরেছে এমন বোধকরি আর কোন উপন্যাস নয়। গল্পের ক্ষেত্রে এলেও একই ব্যাপার দেখতে পাই। বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, একাদশী বৈরাগী প্রভৃতি গল্পের কোন তুলনা হয় না। অথচ সে সব রচনার বিষয়বস্তু কত তুচ্ছ, বহির্জগতে ব্যাপ্ত ভাবনা-ধারণা থেকে কত বিচ্ছিন্ন। যে-শরৎচন্দ্র বিপ্লবের বাণীবাহক, সেই শরৎচন্দ্র অপেক্ষা সংস্কারাবদ্ধ পারিবারিক অকিঞ্চিৎকর গার্হস্থ্য সুখদুঃখের রূপকার শরৎচন্দ্র বাঙালী পাঠকের অধিক প্রিয়। এর থেকে আর্টের নিজস্ব নিয়মনীতির বৈশিষ্ট্যটাই শুধু ধরা পড়ে। শিল্প ব্যক্তির সুখ-দুঃখ প্রেম-ভালবাসা, ব্যর্থতা নৈরাশ্য আশার উল্লাস ইত্যাদিকেই বড় করে দেখে; ব্যক্তির ভাবজীবনকে নয় বা তার আদর্শবাদকে নয়। আদর্শবাদ মননশীলতার বস্তু, পক্ষান্তরে ব্যক্তির ব্যক্তিগত হৃদয়ের সংবাদ অনুভূতির বস্তু। শিল্পের কাছে এই শেষোক্তেরই আদর বেশী। যেহেতু শিল্প ব্যক্তিভিত্তিক, সামূহিক নয়, তার কাছে ভাবজীবনের তত দাম নয়, যত ব্যক্তিগত প্রেমপ্রণয়-আশা-নিরাশার ছবির। শরৎ সাহিত্যের বেলায় এ কথাটা আমরা যত অনুভব করি এমন বোধকরি আর কারও সাহিত্যের বেলায় নয়।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি সমধিক পরিস্ফুট হতে পারে। সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণাগুলিরও একটা স্পষ্টতর ছবি পাওয়া যেতে পারে।

আমরা জানি শরৎচন্দ্র কয়েকটি বিদ্রোহিনী নারীচরিত্রের সৃষ্টি করেছিলেন। তার মধ্যে শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বের অভয়া, তৃতীয় পর্বের সুনন্দা, চরিত্রহীন উপন্যাসের কিরণময়ী ও শেষ প্রশ্নের কমল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে আবার সবচেয়ে বিদ্রোহিনী অভয়া। কেবল কথায় বিদ্রোহিনী নয়, আচরণে বিদ্রোহিনী। অভয়া রোহিণীবাবুর সমভিব্যাহারে বর্মা মুল্লুকে এসেছিল বিয়ের পর থেকেই নিখোঁজ স্বামীর খোঁজ করতে। এসে দেখল স্বামী এক

বর্মিনীকে বিয়ে করে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে দিব্যি জমিয়ে বসেছে। এক মদ্যপ উচ্ছৃঙ্খল কদর্যরুচি স্বামী। স্ত্রীর ক্ষীণতম স্মৃতিও আর তার মনে জাগরূক নেই। অভয়ার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহ করে উঠলো। ইতোমধ্যে রোহিণী তাকে ভালবেসে ফেলেছিল এবং তার সেই কামনা অব্যক্ত থাকেনি। অভয়া স্বামিত্বের আলেয়ার পিছনে আর বৃথা ধাওয়া না করে রোহিণীকে নিয়েই ঘর বাঁধলে, তারা স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করতে লাগল। দাম্পত্য আদর্শের অভ্যস্ত মূল্যবোধে লালিত বাঙালী পাঠকের পক্ষে সাংঘাতিক চমক সন্দেহ নেই। কিন্তু এই চমকসৃষ্টিকারী আচরণেরও যুক্তি জুগিয়েছেন শরৎচন্দ্র অভয়ার জবানীতে। অভয়া শ্রীকান্তকে বলছে: "রোহিণীবাবুকে ত আপনি দেখে গেছেন। তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই; এমন লোকের সমস্ত জীবনটাকে পঙ্গু করে দিয়ে আমি আর সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্ত-বাবু।......একটা রাত্রির বিবাহ অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছে স্বপ্নের মত মিথ্যা হয়ে গেছে, তাকে জোর করে সারা জীবন সত্য বলে খাড়া করে রাখবার জন্য এই এতবড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ করে দেব? যে বিধাতা ভালবাসা দিয়েছেন তিনি কি তাতেই খুসি হবেন?"

অভয়ার মনের পরিচয় আমরা পেলুম। এদিকে প্রখরবুদ্ধিশালিনী প্রদীপ্ত আগুনের শিখারূপিণী কিরণময়ী চরিত্র যুগযুগসঞ্চিত ভারতীয় নারীর পাতিব্রত্যের সংস্কার আর সেই সংস্কারকে অস্বীকার করবার নির্ভীকতার অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত দ্বিধাপীড়িত নারীর এক চমৎকার আলেখ্য। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভার কিরণময়ীর মত সাহসিকা মননশীল নারীও শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারেনি, সে পাগল হয়ে যায়। তার পাগল হওয়ার বীজ তার স্বভাবের অন্তর্নিহিত কনট্র্যাডিক্শনের মধ্যেই নিহিত ছিল—এইজন্য শরৎচন্দ্রকে দোষ দেওয়া বৃথা। শরৎচন্দ্র এই ক্ষেত্রে বাস্তববাদী শিল্পীর ন্যায় কিরণময়ীর স্বভাবকে অনুসরণ করে তার পরিণাম যা হতে পারে তা-ই দেখিয়েছেন, নিজের পীড়নেচ্ছার দ্বারা চালিত হয়ে কিরণময়ীকে তার স্খলনের জন্য শাস্তি দিতে যাননি, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে-শাস্তি কল্পনীয় ছিল। (বিষবৃক্ষের কুন্দ আর কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণীর পরিণাম স্মরণীয়)। কিন্তু কিরণ-ময়ীর জীবন স্বীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের ভারে বিপর্যস্ত হয়ে ব্যর্থ হয়ে গেলেও বাংলা সাহিত্যে এ এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। এমন চরিত্র শরৎচন্দ্রের কলমেও বেশী ফোটেনি।

পক্ষান্তরে কমল অন্ধস্বামীভক্তির একান্ত বশংবদ দাসীসুলভ আদর্শের কঠোর সমালোচক। সে ইউরোপীয় ক্ষণবাদের পূজারী, ভারতীয় সনাতন আদর্শের শাসিত, মনু প্রভৃতি বিধানদাতাদের দ্বারা জোর-করে-চাপানো পাতিব্রত্যের চিরস্থায়িত্বে তার আস্থা কম। সে পতি-পত্নীর বন্ধন অপেক্ষা পতি-পত্নীর ভালবাসাকে বেশী মূল্য দেয় এবং সে ভালবাসা যদি স্বল্পকালীনও হয়, তার উপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। প্রেমহীন দাম্পত্যের বোঝা সারাটা জীবন নিষ্প্রাণ ভাবে বয়ে বেড়ানো অপেক্ষা প্রেমপূর্ণ দুদিনের দাম্পত্য তার নিকট সমধিক কাম্য। তার প্রতি শিবনাথের ভালবাসা যখন শিথিল হয়ে গেছে, সে তখন পত্নীত্বের দাবীতে শিবনাথের উপর ভার হয়ে চেপে থাকেনি, শিবনাথকে আপন রুচিমাফিক নিজের পথ ও প্রবৃত্তি অনুসরণ করবার স্বাধীনতা দিয়েছে। একদিন শিবনাথের সঙ্গে মন্ত্র সাক্ষী রেখে বিয়ে হয়েছিল বলেই সেই নজীরে গোটা জীবন তার উপর স্ত্রীত্বের অধিকার খাটাতে যাবে এমন হৃদয়ের সম্পর্ক শূন্য সম্পত্তির বোধ কমলের নয়। তার প্রবল আত্মমর্যাদাই তাকে ওই অপমানকর অবস্থা থেকে সযত্নে রক্ষা করেছে। আবার অন্য একদিন যখন অনুভব করলো তার প্রতি অজিতের ভালবাসায় কোন খাদ নেই, সে-ভালবাসা নানা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তখন অজিতকে গ্রহণ করতে তার আটকালো না, যদিও কমল জানতো আশুবাবুর কন্যা মনোরমা এক সময় অজিতের বাগ্‌দত্তা ছিল। মনোরমা ও অজিতের মধ্যে ভালবাসার আকর্ষণ ফুরিয়ে গিয়েছিল বলেই কমল সেই শূন্যস্থান পূরণে আপত্তি করেনি, নয়তো শত প্রলোভনেও তাকে এ কাজে রাজী করানো যেত না।

এই যে তিনটি বিদ্রোহিনী চরিত্রের ছাঁচ এখানে আঁকা হলো তা থেকে মনে হতে পারে শরৎচন্দ্র ভারতীয় সনাতন পাতিব্রত্য তথা একপত্নীত্বের আদর্শকে আঘাত করবার জন্যই এই চরিত্রগুলির পরিকল্পনা করেছিলেন। ঠিক তা নয়। এই সব চরিত্র তাঁর শিল্প-পরিকল্পনার মধ্যে এসেছিল বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত হিসাবে, জীবনে বহুবিচিত্র নারী-পুরুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন, তার থেকে বেছে এই চরিত্রগুলিকে উপহার দিয়েছিলেন। নয় তো তাঁর মনের পক্ষপাত ছিল ভারতীয় সনাতন হিন্দু একপত্নীত্বের আদর্শের দিকেই। হিন্দু দাম্পত্য আদর্শকে তিনি অত্যন্ত বড় করে তুলে ধরেছেন শুভদা, বিরাজবৌ, অন্নদাদিদি (শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব), সুরবালা (চরিত্রহীন), কুসুম (পণ্ডিতমশাই),

মৃণাল (গৃহদাহ) প্রভৃতি চরিত্রায়ণের সাহায্যে। বিধবার পক্ষে প্রত্যক্ষের তো কথাই নেই, চিন্তায়ও পরপুরুষের ধ্যান করা অনুচিত তার ছবিটি ফুটিয়েছেন বড়দিদির মাধবী ও পল্লীসমাজের রমা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। মৃণাল বিধবা হওয়ার পরে তারও উপর তিনি একই বরাত চাপিয়েছেন। শরৎচন্দ্র পূর্বোক্তা শ্রীমতী লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন তিনি তাঁর বইতে একটি বিধবারও পুনর্বিবাহ ঘটাননি। কেন ঘটাননি সে-কারণ তিনি অনুক্ত রেখেছেন। কারণটি বিশ্লেষণ করে বোঝাবার প্রয়োজন অনুভব করেননি। বুদ্ধিগতভাবে তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন তার একাধিক নজীর তার চিঠিপত্রের মধ্যে রয়েছে ; কিন্তু বুদ্ধির সমর্থন এক, হৃদয়ের অনুমোদন আর। উপর-উপর আমরা বুদ্ধি দিয়ে যা বিশ্বাস করি, সব সময় হৃদয় দিয়ে তা মেনে নিতে পারি না। সংস্কার সহজে মরতে চায় না। কঠিন পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রায়ই তা বুদ্ধির যুক্তিকে নাকচ করে দেয়। শরৎচন্দ্রের বেলায় এইরকম কিছু একটা ঘটেছিল কিনা তা একটা প্রশ্নচিহ্ন হয়েই রইল।

পথের দাবীর আখ্যানভাগে দেখতে পাই স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় নবতারা তার স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছিল। কবি ও বেহালাবাদক শশীর সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিকঠাক, হঠাৎ জানা গেল আহমেদ নামক এক মিলের টাইম-কিপার মুসলমান যুবককে বিয়ে করে সে শশীকে পথে বসিয়েছে। এই গল্পের মর‍্যাল কী হতে পারে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অবকাশ থাকাই স্বাভাবিক, তবে লেখকের মনোগত অভিপ্রায়কে বোঝার ভুল বোধহয় হওয়ার কথা নয়। এ নবতারা নামক একটি বিশেষ মেয়ের অনুচিত স্বাধীনচারিতার প্রশ্ন শুধু নয়, ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে যে-কোন বিবাহিত নারীর স্বামী ত্যাগের অনৈতিকতাকেই সম্ভবতঃ এখানে ইঙ্গিতে সমালোচনা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। (পথের দাবী উপন্যাসের আর কোথাও মুসলমানের নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই নবতারার কাহিনীতে ওই মেয়েটির স্বভাব-তারল্য ফুটিয়ে তোলবার জন্য একটি মুসলমান যুবকের আমদানী করা হলো কেন তা একটি ধাঁধা হয়ে রইল।)

আসলে খেলাচ্ছলে অথবা তুচ্ছ কারণে স্বামী ছেড়ে চলে আসার চটুলতাকে শরৎচন্দ্র আদপেই সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। অভয়ার ব্যতিক্রমী

দৃষ্টান্তের চিত্র আঁকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে তাঁর মনোভাব আপসহীন ছিল বলে মনে হয়। পতিগতপ্রাণা নারীচরিত্রগুলিকে প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে আঁকার মধ্যেই তাঁর এই মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্নদাদিদিকে তিনি কী মহীয়সী করেই না এঁকেছেন। স্বামীর শত অত্যাচারেও অন্নদা-দিদির সতীত্ব টোল খায়নি। বিরাজের সতীত্বকে তিনি তার সাময়িক বিভ্রম সত্ত্বেও শেষাবধি অস্খলিত ও নিষ্কলুষ রেখেছেন। স্বামী উপন্যাসে বাল্য-প্রণয়ের অজুহাতে পরপুরুষের প্রতি আকর্ষণের আবেগকে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করে শেষ পর্যন্ত স্বামিত্বের আদর্শকে খুবই বড় করে দেখানো হয়েছে। অধঃপতিত স্বামীর হাতে বহুবিধ লাঞ্ছনা-বঞ্চনা সত্ত্বেও শুভদার অপার সহিষ্ণুতা, ক্ষমা-প্রবণতা নারীজাতির পক্ষে এক মহাঅনুকরণযোগ্য গুণরূপে কীর্তিত হয়েছে ওই নামীয় উপন্যাসে। সরযূ ও কুসুমের স্বামী-পরিত্যক্তা হওয়ার কষ্ট চরম করে দেখানো হয়েছে শুধু স্বামিত্বকেই গৌরবান্বিত করে তোলবার জন্য। ষোড়শীর লুপ্তপ্রায় স্বামিত্বের সংস্কার জেগে উঠেছে দীর্ঘদিন বাদে জীবানন্দকে দেখার ফলে।

কিন্তু এহো বাহ্য। স্বামিত্বের গৌরব সবচেয়ে বড় করে দেখানো হয়েছে চরিত্রহীন উপন্যাসের সুরবালার মধ্যে। সুরবালার পতিভক্তির শক্তি ও পবিত্রতাকে এতটাই মহিমা দেওয়া হয়েছে যে, কিরণময়ীর মত বুদ্ধিশালিনী সনাতন শাস্ত্রশাসনের বিধিবিধান লঙ্ঘনকারিণী সাহসিকা রমণী ওই চরিত্রের সংস্পর্শে এসে একেবারেই যেন চকিতে পাল্টে গেল। কিরণময়ীর মধ্যে যে অন্তর্সংঘাত দেখানো হয়েছে তার মূলে রয়েছে এই স্বামীঅন্তপ্রাণ নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব। সুরবালার স্বামীভক্তির প্রবলতা দেখে কিরণময়ী তার মরণোন্মুখ স্বামীকে প্রাণভরে সেবা করতে শিখলো। স্বামীকে যদিও বাঁচানো গেল না তবু তখন থেকেই শুরু হলো এই নারীর জীবনে বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের দ্বন্দ্ব। ট্রাজিডি এখানে যে, কিরণময়ী এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে পারেনি। ওই দ্বন্দ্বের ফলেই শেষ পর্যন্ত তার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে।

আমি প্রবন্ধের গোড়ায় বলেছি শরৎচন্দ্র ব্যক্তির স্বাধীনতার পক্ষপাতী কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে এলেই তাঁকে অন্যরূপে দেখতে পাই। সেখানে তিনি মূলতঃ রক্ষণশীল। সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও আচার-প্রথাই যেন গার্হস্থ্য জীবনের স্তরে তাঁর মনোহরণ করেছে বেশী। যদিও

সঙ্গে সঙ্গে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর রক্ষণশীলতাও তাঁর শিল্পসৃষ্টির গুণে পরম আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। পক্ষান্তরে বৃহত্তর সামাজিক প্রশ্নে কখনও তিনি রক্ষণশীল কখনও প্রগতিশীল। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাতের প্রশ্নে কখনও তিনি সমাজকে জয়ী করেছেন (যেমন রমার বেলায়, সাবিত্রীর বেলায়), কখনও ব্যক্তিকে জয়ী করেছেন (যেমন অভয়ার বেলায়)। এই মিশ্র মানসিকতার জন্য দায়ী তাঁর ব্যক্তিক স্বভাবের গঠন, যার মূলে কৌলিক সংস্কার অনেকটাই কাজ করেছে। তাছাড়া, তাঁর বাস্তববাদও এইরকম দ্বৈধতার একটি কারণ। শিল্পী হিসাবে শরৎচন্দ্র মূলতঃ বাস্তববাদী। তিনি একাধিক জায়গায় বলেছেন, তিনি সমাজ-সংস্কারক নন, সমাজে সত্যি সত্যি যা ঘটেছে তাকে রূপ দিয়েই তিনি খালাস। সমাজে যে সব সমস্যা রয়েছে তার প্রতি তিনি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু সমস্যা সমাধানের ভার তাঁর উপরে নয়। আর্টিস্ট হিসাবে সেটা তাঁর কৃত্যও নয়। তিনি আর্টিস্ট, সমাজের প্রকৃত চেহারাটা ফুটিয়ে তুলতে পারলেই তাঁর কর্তব্য সমাধা হয়ে গেল।

তবু এরই মধ্যে কখনও কখনও শরৎ-মানসের প্রগতিশীল দ্যুতি ঝিলকিয়ে উঠেছে। তিনি যেন কোন কোন ক্ষেত্রে সমাধান দেওয়ার কিনারায় পৌঁছে গেছেন বলে মনে হয়। কৌলীন্য প্রথা যে একটি অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠান তা তিনি ভাল করেই দেখিয়েছেন তাঁর বামুনের মেয়ে বড় গল্পে। মেল-প্রবর-গাঁই-গোত্র মেলাবার ব্যর্থ চেষ্টায় উদ্যমক্ষেপ ও সময় নষ্ট না করে বর ও কন্যার স্বেচ্ছা-নির্বাচনের ঔচিত্য ও সুস্থতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন অরক্ষণীয়া উপন্যাসের জ্ঞানদা ও অতুলের পারস্পরিক আকর্ষণকে শেষপর্যন্ত জয়ী করে। তেমনি দত্তা উপন্যাসে বিজয়া ও নরেনের পারস্পরিক স্বাভাবিক আকর্ষণকে মর্যাদা দিয়েছেন ও পরিণামে বিবাহের শীলমোহর দিয়ে তাকে পাকা করে তুলেছেন বিলাসের সঙ্গে বিজয়ার বাগ্‌দত্তা হওয়ার কৃত্রিমতাকে অগ্রাহ্য করে। আহারাদির বাছবিচার নিয়ে এত যে তাঁর খুঁতখুঁতে বাই,—তাঁর গল্পোপন্যাসে ছোঁয়াছুঁয়ির প্রসঙ্গ একটা সদাবিদ্যমান ধুয়ার মত বারে-বারেই ফিরে এসেছে—গৃহদাহ উপন্যাসের শেষটি পড়লে কিন্তু মনে হয় ছোঁয়াছুঁয়ির অন্তঃসারশূন্যতাই তাঁর প্রতিবাদ্য। অন্ততঃ এই উপন্যাসে যে প্রতিবাদ্য তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। রামবাবু তো হিন্দুধর্মের মহিমা প্রকটনের উদ্দেশ্যে অচলার কাছে স্বপাক আহারের উপযোগিতা, শুদ্ধাচারী

হয়ে চলবার উপযোগিতা, হিন্দুর স্বধর্মনিষ্ঠায় স্থিত থাক্‌বার সার্থকতা ইত্যাদি বিষয়ে কত গালভরা কথাই বললেন; কিন্তু যখন জানতে পারলেন না জেনে তিনি এক বিধর্মী ব্রাহ্মকন্যার হাতের পাক অন্ন গ্রহণ করেছেন তখন তাঁর সদাশয়তার খোলসটা আর বজায় রইল না। সুরেশকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ও অচলাকে নিতান্ত অপরিচিত পরিবেশে অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে তিনি তখুনি প্রায়শ্চিত্তবিধানের জন্য ছুটলেন কাশীতে তড়িঘড়ি। লেখক এখানে প্রকারান্তরে সংস্কারান্ধতার ক্রূরতাটাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন পাঠকের চোখে। কাহিনীর সমাপ্তিতে তিনি মহিমের মুখে যে ভাবনা বসিয়েছেন তাতেও এই ধারণার সমর্থন মেলে। মহিম মনে মনে ভাবতে লাগলো......"কিন্তু এই আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের এই ধর্ম কোন্ সত্যকার ধর্ম, যাহা সামান্য একটা মেয়ের প্রতারণায় এক নিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল, যে ধর্ম অত্যাচারীর আঘাত হইতে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করিতে পারে না, বরঞ্চ তাহাকেই মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে সমস্ত শক্তি অহরহ উদ্যত রাখিতে হয়, সে কিসের ধর্ম এবং মানব-জীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা কোনখানে? যে ধর্ম স্নেহের মর্যাদা রাখিতে দিল না, নিঃসহায় আর্ত নারীকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া যাইতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করিল না, আঘাত খাইয়া যে ধর্ম এতবড় স্নেহশীল বৃদ্ধকে এমন চঞ্চল প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া দিল, সে কিসের ধর্ম? ইহাকে যে স্বীকার করিয়াছে, সে কোন্ সত্য বস্তু বহন করিতেছে? যাহা ধর্ম সে ত বর্মের মত আঘাত সহিবার জন্যই। সেই তো তার শেষ পরীক্ষা!" (শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, সপ্তম সম্ভার, পৃ. ২৬২-৬৩)

এই থেকে পরিষ্কার মনে হয়, শরৎচন্দ্র ধর্মের নামে আচার-বিচার ছোঁয়াছুঁয়ির বাড়াবাড়িকে কখনও যথার্থ সমর্থন করতে পারেননি। তিনি ধর্মের মূলবস্তুকে ধর্মের সারাৎসার বলে নির্দেশ করতে চেয়েছেন—তার আনুষ্ঠানিকতা কিংবা আচারকে নয়। কিন্তু শরৎ সাহিত্য পূর্বাপর অনুধাবন করলে এ বিষয়ে সংশয় ঘুচতে চায় না। উপরের উদ্ধৃতিতে যে-মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, সেই মনোভাবের সঙ্গে তাঁর রচনা সর্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেনি। আহারের বাছবিচার নিয়ে তাঁর চরিত্রগুলির অনেক কটিরই এত বেশী মাথাব্যথা যে, সন্দেহ হয় এই মাথাব্যথার খানিকটা গ্রন্থকারের নিজের মাথাব্যথারই প্রক্ষেপণ মাত্র। ব্রাহ্মণত্বের তথাকথিত মহিমা ও

শ্রেষ্ঠত্বের ভাবটিকে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা এত প্রকট এবং তাই নিয়ে চিত্র-চরিত্রের এত ছড়াছড়ি যে, কখনও কখনও ওই স্বাজাত্যাভিমান রীতিমত বিসদৃশতার কোঠায় গিয়ে পড়েছে। ব্রাহ্মণের পৈতেগাছটির প্রতি শরৎচন্দ্রের বড় মায়া—এমনতর মায়ায় বদ্ধ হয়ে তিনি একাধিক বৈপ্লবিক চরিত্রের স্রষ্টা হয়েও চূড়ান্ত বিচারে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা কিংবা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে উঠতে পারলেন না।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি তাঁর বড়ই অনীহা। কথায় বলে, যে যে ভাবে মানুষকে দেখতে চায় সে সেই ভাবেই তাকে চিত্রিত করে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি বিরাগ প্রদর্শনের জন্যই তিনি যেন দত্তার রাসবিহারী চরিত্রকে ইচ্ছা করে বেশী বেশী কালির পোঁছ দিয়ে কালিমালিপ্ত করে এঁকেছেন। গৃহদাহের কেদারবাবুর অর্থলোলুপতাকে চিত্রিত করবার পিছনেও একই উদ্দেশ্য কাজ করেছে বলে সন্দেহ হয়। কোন মহৎ শিল্পীর মধ্যে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণচিত্ততা সহজে ভাবতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথের গোরার পরেশবাবুর ঔদার্যের সঙ্গে তুলনা করলেই বুঝতে পারা যাবে এই চরিত্র দুটির অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি কোথায়? কূটকচালে বুদ্ধি ও অর্থলোলুপতা কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যে সেই দুটি দোষ দেখাবার জন্য একটি বিশেষ সম্প্রদায়কেই বেছে নিতে হবে। ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা হিন্দু সমাজের প্রচলিত গণ্ডী ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে এসে ধর্মসংস্কার করতে চেয়েছিলেন বলে শরৎচন্দ্র কোন সময়েই তাঁদের ক্ষমা করতে পারেননি। কিন্তু একবারও তাঁর এ কথাটা খেয়াল হয়নি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে শিক্ষায় সমাজ সংস্কারে রাজনৈতিক চেতনার জাগরণে সাহিত্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে একাধিক কু-প্রথার (যথা, বাল্যবিবাহ, নারীনিগ্রহ, সুরাপান ইত্যাদি) মূলোচ্ছেদ চেষ্টায় এই ব্রাহ্ম সমাজই সবচেয়ে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যে-রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই, তিনিও ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত মানুষ। যদিও একথা বলাই বাহুল্য যে, কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মসম্প্রদায়ের ছাপ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মত বড় মনের মানুষকে চিহ্নিত করতে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা। শরৎচন্দ্র এত এত জায়গায় ঘুরে এত এত মানুষের সঙ্গ ও এত এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পরও এমন অনুদার রয়ে যেতে পারলেন কেমন করে সে আমাদের এক স্থায়ী প্রশ্ন।

যাই হোক, এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি অসম্পূর্ণতা অসঙ্গতির প্রশ্ন বাদ দিলে শরৎচন্দ্র কিন্তু এক অসামান্য শিল্পী। তাঁর দরদের কোন তুলনা নেই। তাঁর ভাষা ও স্টাইল চেখে চেখে ভোগ করবার মত এক পরম স্বাদু বস্তু। পল্লীভিত্তিক উপন্যাস-গল্প রচনাতেই তাঁর সৃষ্টির শিল্পোৎকর্ষ সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু তাঁর ভাষাটি পুরাপুরি নাগরিক মেজাজের। এটা তাঁর সম্পর্কে হতবুদ্ধি হয়ে লক্ষ্য করবার মত এক অদ্ভুত ব্যাপার যে, যে-গোঁড়ামি ও সংরক্ষণকামিতার জন্য এই প্রবন্ধে বারে বারে তাঁর সমালোচনা করেছি, সেই গোঁড়ামি ও সংরক্ষণশীলতার আধারে রচিত তাঁর পারিবারিক গল্প-উপন্যাসগুলিতেই কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পোৎকর্ষ ব্যঞ্জিত হয়েছে। মননশীল বইগুলি পাঠকচিত্তের উপর তেমন দাগ কাটতে পারেনি।

পথের দাবী উপন্যাস এই ব্যর্থতার একটি নিদর্শন। উপন্যাসটির আরম্ভ হয়েছিল অতি চমৎকারভাবে, সেই যেখানে সব্যসাচী গেঁজেল গিরিশ মহাপাত্র রূপে রেঙ্গুনের জেটিতে আত্মপ্রকাশ করছে ও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সটকে পড়ছে, সেই অংশটির কোন তুলনা নেই। কিন্তু তার পরেই যেন বইটি কেমন মিইয়ে গেছে। রাষ্ট্র-বিপ্লব সম্পর্কে সব্যসাচীর গালভরা বুলিগুলিও পড়তে ভালই লাগে কিন্তু ভারতীর সঙ্গে বসে বসে অন্তহীন কথার কচকচি এক এক সময়ে রীতিমত বিরক্তিকর ঠেকে। সব্যসাচীকে যদি একজন দরদী মানবতাবাদী চরিত্র রূপে আঁকাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল তাহলে সূচনায় এমন কঠিন বিপ্লবের গৌড়-চন্দ্রিকা ফাঁদা হয়েছিল কেন? বইটা একেবারেই মাঠে মারা গেছে অপূর্ব-ভারতী জুটির তুচ্ছ আকর্ষণ-বিকর্ষণের পালার বর্ণনায় পাতার পর পাতা ভরাতে গিয়ে।

তবু সব্যসাচীর কথাগুলির দাম আছে। এই থেকে শরৎচন্দ্রের রাষ্ট্রিক চিন্তার কাঠামোর একটা আভাস পাওয়া যায়। এই উপন্যাসের বক্তব্য ও অন্যান্য রচনাংশ থেকে মনে হয় শরৎচন্দ্র অহিংসা তত্ত্বের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না, দেশের স্বাধীনতা ও তৎপরবর্তী সমাজ বিপ্লব সাধনের জন্য সশস্ত্র পন্থার কার্যকারিতাতেই তাঁর সমধিক বিশ্বাস ছিল। তবে তাঁর চোখে রক্তারক্তিটাই বিপ্লব নয়, বিপ্লব মানে একটা 'দ্রুত আমূল পরিবর্তন' (সব্যসাচী)। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক উপন্যাসগুলির দৃষ্টিভঙ্গির আদৌ কোন মিল নেই।

শরৎচন্দ্রের পারিবারিক উপন্যাসগুলির পটভূমিকায় পথের দাবী বা এই জাতীয় রচনা যেন একটা বিচ্ছিন্ন শিল্পকর্ম রূপে আলাদা হয়ে ঝুলে আছে। শরৎচন্দ্র মূলতঃ সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থায় লালিত ছায়াচ্ছন্ন পল্লীর গার্হস্থ্য জীবনের শিল্পী, তাঁর শিল্পের পরিকল্পনার মধ্যে একটা পথের দাবী কিংবা একটা শেষ প্রশ্ন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। এই দুই ধরনের রচনা কর্মের মধ্যে না আছে মেজাজের মিল, না চিন্তা-কল্পনার সামঞ্জস্য। একের বক্তব্য অন্যে খারিজ হয়ে যাচ্ছে। নিষ্কৃতি-পল্লীসমাজ-পণ্ডিতমশাই-অরক্ষণীয়ার লেখকের সঙ্গে পথের দাবী-শেষ প্রশ্নের লেখককে ঠিক কেমন যেন মেলানো যায় না।

আজকাল শরৎচন্দ্রকে কোন কোন রাজনৈতিক মহল থেকে একজন প্রকৃষ্ট বৈপ্লবিক লেখকরূপে প্রতিপন্ন করার একটা চেষ্টা চলেছে দেখতে পাই। এই চেষ্টার উদ্দেশ্য মন্দ তা বলিনে, তবে শিল্প বিচারকে একপাশে সরিয়ে রেখেই যেন চেষ্টাটি করা হচ্ছে বলে মনে হয়। এই চেষ্টায় রাজনীতির উপর বড্ড বেশী ঝোঁক আরোপ করা হচ্ছে, তুলনায় রসের দিকটা মোটেই আমল পাচ্ছে না। শিল্পসৃষ্টির সৌন্দর্য বিচার করতে গেলে পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন তো দূর স্থান, এমনকি গৃহদাহ, চরিত্রহীন এই দুই বহুপ্রশংসিত উপন্যাসকেও ছাপিয়ে বড় হয়ে দেখা দেবে তাঁর স্বল্পপরিসর বাঙালী জীবনের সাধারণ সুখদুঃখের কাঠামোয় রচিত গ্রামীন গল্প-উপন্যাসগুলি। এক নিষ্কৃতি বইখানাকে একশো বইয়ের সমতুল বলতে হয়। এগুলির আবেদন প্রাদেশিক, বিষয়বস্তু অকিঞ্চিৎকর, সুর কমবেশী রক্ষণশীল; কিন্তু শিল্পের পক্ষপাত এদের প্রতিই যেন বেশী ন্যস্ত। চিন্তার দিক দিয়ে তাদৃশ প্রগতিশীল না হয়েও কোন কোন শিল্পকর্ম পাঠকের মনকে কেন ও কেমন করে রসে আপ্লুত করে রাখে, শিল্পের এই অন্যায্য পক্ষপাতের রহস্যের মূল কোথায় সেই ধাঁধার আজও পর্যন্ত নিরসন হয়নি। পদে পদে শরৎ সাহিত্যে এই ধাঁধার মুখোমুখি হতে হয়।

॥ ৬ ॥

ছোটগল্প

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের সংখ্যা বেশী নয়। গোণাগুণতি করলে দেখা যাবে বড় ও ছোটগল্পে মিলিয়ে পনেরো-ষোলটির বেশী হবে না। অথচ এই সংখ্যাস্বল্পতা সত্ত্বেও তিনি একজন অসামান্য ছোটগল্পের স্রষ্টা। তাঁর মহেশ, মামলার ফল, একাদশী বৈরাগী, অভাগীর স্বর্গ, রামের সুমতি প্রভৃতি গল্প বিশ্বসাহিত্যের যে কোন শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। মহেশ গল্পটি একাই একশো। সামাজিক অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আকৃতিতে পূর্ণ মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ এমন সংবেদনশীল করুণ রসের গল্প খুব অল্পই লেখা হয়েছে আমাদের সাহিত্যে ; বিশ্বসাহিত্যেও যে এর দোসর খুব বেশী আছে তা মনে হয় না।

শরৎচন্দ্র আসলে ছোটগল্পেরই শিল্পী। যদিও নামতঃ ছোটগল্প তিনি অল্পই লিখেছেন। যে কটি রচনা শিল্পসৌন্দর্যের জন্য বিশেষরূপে খ্যাত—নিষ্কৃতি, অরক্ষণীয়া, পল্লীসমাজ, বিরাজ বৌ, বিন্দুর ছেলে, বৈকুণ্ঠের উইল, বড়দিদি, মেজদিদি, বামুনের মেয়ে প্রভৃতি—সেগুলি উপন্যাস বলে কথিত ও পরিচিত হলেও কার্যতঃ উপন্যাসোপম বড় গল্প মাত্র। এগুলি নভেলেট, নভেল নয় ; আর নভেলেটের সঙ্গে বড় ছোটগল্পের পার্থক্য শুধু নামেই, পার্থক্যের রেখাটি খুব সুচিহ্নিত নয়। শরৎচন্দ্র ছোটগল্প রচনায় আয়তন সংকোচের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না—তিনি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গল্প লিখতেই ভালবাসতেন। বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা এক চিঠিতে এইরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন যে, খুব সংক্ষিপ্ত আয়তনের গল্প লিখতে তিনি তেমন স্ফূর্তি পান না, একটু বিস্তার করে লেখাই তাঁর পছন্দ। তাঁর গল্পগুলিই তাঁর এ পছন্দের সাক্ষ্য দেবে। উল্লিখিত গল্পসমূহ এবং অন্যান্য গল্পনামধেয় রচনা কোনটারই আয়তন খুব হ্রস্ব নয়। বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, বামুনের মেয়ে, ছবি, পথনির্দেশ, অনুরাধা প্রভৃতি গল্পের আকার তো রীতিমত বড়।

এই দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সুস্পষ্ট তফাৎ।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের গল্প অধিকাংশই মধ্যমাকৃতি—খুব ছোটও নয় খুব বড়ও নয়। ব্যতিক্রম, মেঘ ও রৌদ্র, জীবিত ও মৃত, সমাপ্তি, নষ্টনীড়, রাসমণির ছেলে, ক্ষুধিত পাষাণ, হালদার গোষ্ঠী প্রভৃতি রচনা। শরৎচন্দ্রের বেলায় এই ব্যতিক্রমটাই নিয়ম। ছোটগল্প নাকি বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু দর্শন করায়। গোষ্পদের জলে নাকি আকাশকে বিম্বিত করে। এই তত্ত্বটির প্রতি আজকালকার কোন কোন ছোটগল্প লেখকের এমনই অভ্রান্ত বিশ্বাস যে, তাঁরা এটিকে তাঁদের রচনায় প্রায়ই একটি অপরিবর্তনীয় সূত্ররূপে গ্রহণ করে আদাজল খেয়ে তার শৈল্পিক রূপদানে সচেষ্ট হন। ভাবেন শিল্পের সবটুকু সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষ এই আয়তন সংক্ষেপের মধ্যেই নিহিত। কিন্তু তাঁদের খেয়াল হয় না যে, বিশিষ্ট এক শিল্পকর্মের আদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখানোর নামে এটা নিজেরই অজান্তে পরিশ্রম বাঁচানোর এক সূক্ষ্ম কৌশলও হতে পারে। ভাষার সম্পদ যাঁর নেই কিংবা ভাষা-শিল্পের সুনিপুণ সবিস্তার প্রয়োগে যাঁর দক্ষতা দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপেই কম, তাঁর পক্ষেই এই জাতীয় চতুর সংক্ষেপিতকরণের আড়ালে আশ্রয় নিতে চাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শরৎচন্দ্র এমনতর প্রয়োজনের দ্বারা বদ্ধ ছিলেন না। তাঁর ভাষার শক্তি ছিল অসাধারণ—কাহিনীবয়ন ক্ষমতা ছিল অতিশয় উচ্চস্তরের। তাই তিনি অক্লেশে, অবাধে গল্পের সূতোয় ঢিল দিয়ে কাহিনীকে যথাইচ্ছা খেলাতেন এবং ওই বিস্তারের মধ্য দিয়ে চমৎকার সব গল্পের সৃষ্টি করতেন।

মহেশ শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গল্প। বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে গল্পের কাহিনীটি সুবিদিত। একটি গরুকে নিয়ে গল্প। আর এই গল্পের মধ্য দিয়ে গ্রামের ক্ষমতাবান শ্রেণীর শোষণ ও অত্যাচার আর হতদরিদ্র শ্রেণীর চাষীর অভাব-রিক্ততা ও অসহায়তার ছবি অতি নগ্নভাবে প্রকটিত হয়েছে রচনাটিতে অপূর্ব শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়ে। গাঁয়ের জমিদার শিবচরণবাবু, হিন্দুশাস্ত্রশাসনের ক্রূরতার প্রতীক ন্যায়রত্ন, গরীব চাষী গফুর জোলা ও তার দশ বছরের মেয়ে আমিনা আর এক গৃহপালিত ষাঁড় (মহেশ)—এই কটি এই গল্পের চরিত্র। রচনার গুণে অবোলা জীবও যে কেমন করে গল্পের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা পেতে পারে মহেশ গল্পে তা আশ্চর্য শিল্পসিদ্ধির সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। গল্পের শেষে আছে গো-হত্যার ঘটনা—অভাবের তাড়নায় আর অত্যাচার নিষ্পেষণের ফলে সাময়িক আত্ম-

বিস্মৃতির বশে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে গফুর নিজের হাতেই তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মহেশের প্রাণসংহার করলে। তারপর দুঃখে শোকে অনুশোচনায় যন্ত্রণাবিদ্ধ হতভাগ্য ওই চাষী, মেয়ের হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। চটকলে কাজ করলে নাকি মান-সম্মান ইজ্জৎ থাকে না। কিন্তু নিরুপায় গফুরের সামনে বাঁচবার আর কোন পথ খোলা ছিল না। গাঁয়ের জমি থেকে উৎপাটিত হয়ে কারখানার এই অসম্মানের জীবনকেই সে শেষ পর্যন্ত বরণ করে নিতে বাধ্য হলো। কৃষক কী করে অবস্থার চাপে কলের মজুর হয় তার একটি সংকেত এই গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়।

গল্পে গো-হত্যার দৃশ্য আছে বলে নাকি এই অনবদ্য গল্পটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রচনা-সংকলনে একদা স্থান পেয়েও পরে প্রত্যাহৃত হয়েছিল। তার জায়গায় পাঠ্য হয়েছিল কোন এক বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি কীর্তনীয়ার লেখা প্রেমের ঠাকুর নামক এক ওঁচা গল্প। এই না হলে আর লোকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের রসবুদ্ধির তারিফ করবে কেন! শরৎচন্দ্র নিজে এই ঘটনাটিতে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর সেই ক্ষোভের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণের মধ্যে। ওই ভাষণে তিনি মহেশ গল্পটির একটি সংক্ষিপ্ত-সার বিবৃত করে তারপর এরূপ মন্তব্য করেছেন—"এই হ'ল গো-হত্যা। এই পড়ে হিন্দুর ছেলের বুকে শেল বিঁধবে। তার চেয়ে পড়ুক 'প্রেমের-ঠাকুর'। তাতে ইহলোকে না হোক তাদের পরলোকে সদ্‌গতি হবে।" (শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, ষষ্ঠ সম্ভার, পৃ. ৩৫৭)

রামের সুমতি আর মামলার ফল এই দুটি গল্পের মধ্যে বিষয়গত কিছু সাদৃশ্য আছে। দুটি রচনারই মূলরস—বাৎসল্য। রামের সুমতির রাম আর মামলার ফলের গয়ারাম দুজনাই গোঁয়ার-গোবিন্দ গোছের দুর্দান্ত স্বভাবের কিশোর বালক। রামের যতকিছু আবদার তার বৌদি নারায়ণীর কাছে, আর গয়ারামের আবদার তার জ্যাঠাইমা গঙ্গামণির কাছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আবদার যতই অসঙ্গত আর অযৌক্তিক হোক না কেন, মাতৃস্নেহ সেই সব আবদার-উৎপাত-দৌরাত্ম্য সহ্য করে বাৎসল্যের গভীর টানে। এই বাৎসল্যের ভাবটিকেই পরম রমণীয় করে প্রকাশ করা হয়েছে দুটি গল্পে। গল্প দুটির শিল্প-সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই। তবে খতিয়ে দেখতে গেলে তুলনায় রামের সুমতিকেই উৎকৃষ্টতর রচনার মর্যাদা দিতে হয়। কেননা

এই গল্পে স্নেহের আকর্ষণটিকে অনেক বেশী মধুর করে আঁকা হয়েছে, আর চরিত্রগুলির বিকাশের দিকেও অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই গল্পটিকে শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প আখ্যা দিয়ে গেছেন।

এই দুই গল্পেরই স্বগোত্র কিন্তু স্বাদে গন্ধে কিছু ভিন্ন বিন্দুর ছেলে গল্পটি। বিন্দুর ছেলেও বাৎসল্যের গল্প তবে এই বাৎসল্য এখানে তীব্রতর হয়েছে বন্ধ্যানারীর সন্তানস্নেহপিপাসার রূপ ধরে এবং পরের সন্তানকেই নিজের সন্তানের স্থলাভিষিক্ত ক'রে। অন্নপূর্ণা ও বিন্দুবাসিনী দুই জা। অন্নপূর্ণা যাদবের পত্নী, বিন্দু মাধবের। একান্নবর্তী পরিবার। বিন্দুর ছেলেপুলে হয়নি, দিদি অন্নপূর্ণার সন্তান অমূল্যকে ঘিরেই তার যত কিছু সাধ-আহ্লাদ, স্নেহের উৎসার। বিন্দু ধনী পিতার কন্যা তাই কিছু গরবিনী কিন্তু মনটি তার সাদা। অমূল্যর সামান্য অনাদর হলেও সে তা সহ্য করতে পারে না এবং তার ফলে কথার পৃষ্ঠে কথার উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে দেবদেবীতুল্য ভাসুর ও ভাসুরপত্নীকে টাকার খোঁটা দিতে ছাড়ে না। এই থেকে পরিবারে মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদ। সেই বিচ্ছেদকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে ননদ এলোকেশী। রামের সুমতি গল্পে যেমন দিগম্বরী, এই গল্পে তেমনি এলোকেশী। শেষপর্যন্ত দুই ভাই আর দুই জা-এর মধ্যে পুনর্মিলনে গল্পের পরিসমাপ্তি। অমূল্যকে নিজের কাছে ফিরে পেয়ে বিন্দুর অশান্তির শেষ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দেবোপম ভাসুরচরিত্র সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের শিল্পকুশলতার কোন তুলনা হয় না। যিনি ভাসুর, তিনিই আবার জ্যেষ্ঠাগ্রজ। এই দাদা-ভাসুর চরিত্র শরৎচন্দ্রের হাতে পড়ে এক আত্মভোলা, সমদর্শী, পরিবারের সকলের সুখের জন্য সর্বস্বার্থবিসর্জনকারী বৈরাগী চরিত্রে পরিণত হয়েছে। অনেকটা ভোলা মহেশ্বরের মত। এরই আদল পাই বিন্দুর ছেলের যাদব চরিত্রের মধ্যে, আর নিষ্কৃতির গিরিশের মধ্যে। এই টাইপটি বিলীয়মান বা প্রায়বিলুপ্ত বাঙালী যৌথ পারিবারিক প্রথার মানবিক দিকের এক সুন্দর নমুনা।

মন্দির গল্পটি কিছু অবাস্তব। এক তরুণীবিধবার (অপর্ণার) আত্যন্তিক দেবসেবা প্রীতির ছবি। স্বামীর উপাসনাকে ছাড়িয়েও তার মন্দিরে স্থাপিত বিগ্রহের উপাসনায় আগ্রহ, যে-অস্বাভাবিক আগ্রহ তরুণীটির অকাল বৈধব্যের কারণ হলো। তারপর দেখানো হয়েছে মন্দিরের যুবক সেবায়েৎ

শক্তিনাথের সঙ্গে অপর্ণার আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব, শক্তিনাথের মৃত্যুতে তার পরিসমাপ্তি। এটি শরৎচন্দ্রের আদি বয়সের লেখা গল্পগুলির অন্যতম। প্রথম মুদ্রিত গল্প। তৎকালীন 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রাপ্ত। পুরস্কার প্রতিযোগিতায় পাঠানোর সময় মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে পাঠানো হয়েছিল। সেই নামেই ছাপা হয়। কাঁচা প্লট, মনস্তত্ত্ব-চিত্রণ অবাস্তব, পূর্বেই বলেছি। তবে ভাষার মুন্সিয়ানা আছে। লেখার ধাঁচের ভিতর একজন পাকা গল্পকার লুকিয়ে আছে তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

আঁধারে আলো আর একটি প্রথম দিক্‌কার গল্প। এটির কাহিনীও অবাস্তব। কলকাতায় পাঠরত এক তরুণ জমিদারপুত্র ও এক বাঈজীর ভালবাসার গল্প। শরৎচন্দ্রের রচনাসমূহের মধ্যে এটিই বোধহয় সর্বপ্রথম সিনেমায় রূপায়িত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর পথনির্দেশ গল্পটিকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন। বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা একাধিক চিঠিতে তিনি এই গল্পটির প্রতি তাঁর পক্ষপাত ঘোষণা করে গেছেন। বলেছেন, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে জাতীয় গল্প লেখা খুব কঠিন নয়, কিন্তু এই গল্পের প্রকৃতি তেমন নয়। স্পষ্টই এতে নায়ক-নায়িকা চরিত্রের কিছু মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার উন্মোচন করা হয়েছে। সুলোচনা তার স্বামীর মৃত্যুর পর কিশোরী কন্যা হেমনলিনীকে নিয়ে কলকাতায় উদারচরিত ধনী ব্রাহ্ম-যুবক গুণীন্দ্রের গৃহে আশ্রয় পেলে। গুণীন্দ্র আর হেমের মধ্যে ভালবাসা জন্মে এবং দুইয়ের মধ্যে বিবাহ হলে এই ভালবাসা স্বভাবতঃই সার্থকতা পেতে পারতো এবং সেইটাই হতো তার উচিত পরিণতি। কিন্তু ব্রাহ্মের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ায় সুলোচনার ঘোরতর আপত্তি। জাতপাত দেখে হেমের বিয়ে দেওয়া হলো মফঃস্বলের এক ধনাঢ্য জমিদারের (কিশোরীমোহন) সঙ্গে। এই বিবাহ সুখের হলো না এবং এক বছরের মাথায়ই হেম বিধবা হয়ে মাতৃসকাশে ফিরে এলো। গল্পের প্রকৃত শুরু এইখান থেকে। সদ্য বিধবার হৃদয়ের সহজ ভালবাসার প্রবৃত্তির সঙ্গে ভারতীয় নারীর যুগযুগসঞ্চিত পাতিব্রত্যের সংস্কারের ঘটলো দ্বন্দ্ব—গুণীনের উন্মুখ প্রাণের সমস্ত আশাকে নির্মূল করে শেষ পর্যন্ত সংস্কারের হলো জয়। হেম তার অন্তরের মধ্যেই তার পথনির্দেশ পেয়ে গেল।

গল্পের আলেখ্যটি কিছু অবাস্তব। এখানে বাস্তববাদী শিল্পী শরৎচন্দ্রকে

আড়াল করে রক্ষণশীল শিল্পী শরৎচন্দ্র সামনে এগিয়ে এসেছেন। আলো ও ছায়া গল্পটিতেও একই রকমের অবাস্তব চিত্রণ পাই। এই গল্পটিতেও এক যুবক ও এক বিধবা যুবতীর নিতান্ত কাছে থেকেও দূরত্বের ব্যবধান রক্ষা করে চলার ছবি আঁকা হয়েছে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এই দূরত্ব শুধু অবাস্তবই নয়, অস্বাভাবিকও বটে। যজ্ঞদত্ত ও সুরমা এক গৃহে বাস করেও পরস্পরের বন্ধু মাত্র। যজ্ঞদত্ত আলো ও সুরমা তার ছায়া। এই আলোছায়ার বন্ধুত্বের হাঁড়িকাঠে বলি দেওয়া হলো এক নিরীহ নির্বিরোধ সতত-বাধ্য গরিব ঘরের মেয়েকে, যে সুরমার ইচ্ছায় এই গৃহে বধূ হয়ে এসেছিল। যজ্ঞদত্ত একদিনের জন্যও বউকে আদর করেনি বরং সর্বদা দূরে দূরে সরিয়ে রেখেছে, ফলে বউয়ের মনোভঙ্গ হয়ে অসুখ, অসুখ থেকে মৃত্যু। অদ্ভুত মানসিকতার গল্প— এমন অস্বাভাবিক কাহিনী শরৎচন্দ্রের লেখনীতে বিস্ময়কর মনে হয়। যেন একালীন কোন মর্বিড গল্প পড়ছি।

বিলাসী গল্পের কাহিনীটি করুণ। এক সাপুড়ে মেয়ের (বিলাসী) প্রেমে পড়ে কায়েতের ছেলের (মৃত্যুঞ্জয়) জাত দেওয়ার কাহিনী। সাপের ছোবল খেয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হলো। বড়ই শোকাবহ পরিণতি। গ্রাম্য সমাজের নিষ্ঠুরতার প্রাসঙ্গিক চিত্রটিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

সতী গল্পের কাহিনীতে পাই সতীপনার বাড়াবাড়িতে দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি বিপর্যস্ত হওয়ার মর্মান্তিক চিত্র। বিদ্রূপাত্মক গল্পের এক চমৎকার কুশলী নমুনা। হরিলক্ষ্মী গল্পে পাই দুই গ্রামীণ পরিবারের পারস্পরিক সংঘাতের চিত্র। ধনের দেমাক ও দারিদ্র্যের আত্মমর্যাদার লড়াইয়ের এক বাস্তব আলেখ্য। তবে গল্পটি পুরাপুরি রসোত্তীর্ণ হয়েছে এমন কথা বলা যায় না।

শরৎচন্দ্রের দুটি শ্রেষ্ঠগল্প হলো একাদশী বৈরাগী ও অভাগীর স্বর্গ। একাদশী বৈরাগীতে এক সুদখোর বৈরাগীর আপাত-কার্পণ্য ও অতিসতর্ক হিসাবীবুদ্ধির অন্তরালবর্তী অম্লান সত্যনিষ্ঠার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বাইরে থেকে বৈরাগীকে কসাই বলে মনে হয়, সে সুদের এক আধলাও কাউকে মাপ দেয় না। কিন্তু এই লোকটি কিনা বিনা পরিচয়ে বিনা সাক্ষ্যপ্রমাণে শুধু মুখের কথায় বহু বছর আগে তার কাছে গচ্ছিত রাখা অনেকগুলি টাকা তার ন্যায়সঙ্গত ওয়ারিশানকে অক্লেশে ফিরিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, নিজের বিধবা বোনের (গৌরীর) যৌবনে পদস্খলন হয়েছিলো, সমস্ত সমাজের

প্রতিকূলতা ও একঘরে হওয়ার শাস্তি অগ্রাহ্য করে তাকে নিজগৃহে স্থান দেয় ও সর্বপ্রকার সামাজিক নিপীড়ন থেকে তাকে বুক দিয়ে আগলে রাখে। তারই কর্মচারী ঘোষাল বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে সুদখোর বোষ্টম একাদশীকে মনে মনে তাচ্ছিল্য করে কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় বৈরাগীর সততার কণামাত্রও ওই ব্রাহ্মণপুঙ্গবের মধ্যে নেই বরং কী করে গরিব মেয়েছেলের টাকা ও গয়না ফাঁকি দিয়ে কৌশলে সেগুলি আত্মগত করতে পারে তারই সে তাল খুঁজছিল। গৌরীর তৎপরতায় তার সেই জারিজুরি সফল হতে পারলো না। এই সুলিখিত গল্পটির যদি কোন মর‍্যাল থাকে তো তা হলো এই যে, বহিরঙ্গ বিচারের দ্বারা কোন মানুষকেই বিচার করতে নেই, তার আন্তর-পরিচয়ই হলো তার আসল পরিচয়।

অভাগীর স্বর্গ একটি অত্যুৎকৃষ্ট গল্প—বোধকরি শিল্প বিচারে মহেশের পরেই তার স্থান। এই গল্পে গ্রামীণ সমাজে ধনী ও দরিদ্রের সুদূরস্তর পার্থক্য ও তথাকথিত নীচু জাতের প্রতি উচ্চবর্ণের সমাজের মানুষদের মর্মান্তিক অবজ্ঞা ও অবিচারের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। গল্পটি মহেশের মতই সামাজিক তাৎপর্যে ভরা।

॥ ৭ ॥

উপন্যাস

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সংখ্যা পঁচিশ-তিরিশখানা হবে। তার মধ্যে পল্লী-ভিত্তিক উপন্যাসই বেশী। শহরের পটভূমি অবলম্বন করে যে সব উপন্যাস তিনি লিখেছেন তার প্রায় সব কয়টিই একটু বেশী বয়সের রচনা, যেমন চরিত্রহীন, গৃহদাহ, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন প্রভৃতি। গোড়ার দিকের অধিকাংশ উপন্যাসই বাংলার সনাতন পল্লীর চিত্র ও চরিত্রের অবলম্বনে রচিত। যেমন শুভদা, দেবদাস, বিরাজ বৌ, নিষ্কৃতি, অরক্ষণীয়া, পল্লীসমাজ, পণ্ডিতমশাই প্রভৃতি।

শিল্পসৃষ্টির মাপকাঠির বিচারে শরৎচন্দ্রের পল্লীভিত্তিক উপন্যাসগুলিকেই তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিতে হয়। তার কারণ এই উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার একটা অকৃত্রিম প্রাকৃতিক রূপ ফুটে উঠেছে। সে রূপে চোখ মুগ্ধ হওয়ার কথা নয়, কিন্তু পাঠকের সহজেই মনে হবে এ পল্লীবাংলার অত্যন্ত খাঁটি স্বাভাবিক রূপ—ভালয়-মন্দে, সুন্দরে-কুৎসিতে মেশানো বাস্তব রূপ। বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, গতানুগতিক আচার-আচরণের গোঁড়ামিতে পূর্ণ শরৎচন্দ্রের চিত্রিত বাংলার গ্রাম তবু যে বাঙালী পাঠকের চিত্ত একান্তভাবে হরণ করেছে তার কারণ হলো, এই রক্ষণশীল বদ্ধ আবহাওয়ার পৃষ্ঠপটে শরৎচন্দ্র গ্রামের যেসব নরনারীর ছবি এঁকেছেন তারা দোষেগুণে সকলেই বড় কাছের মানুষ, কাউকে অপরিচিত অনাত্মীয় মনে হয় না। একদিকে সংকীর্ণতা দ্বেষ বিদ্বেষ হিংসা নীচতা প্রভৃতি দোষগুলির সঙ্গে যেমন পরিচয় হয়, তেমনি পরিচয় হয় অপরিসীম স্নেহ-বাৎসল্য, সহৃদয়তা, সেবাপরায়ণতা, উদারতা প্রভৃতি বিচিত্র সদ্গুণের সঙ্গে। শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত সংস্কারান্ধ সামন্ততান্ত্রিক এঁদো পাড়াগাঁয়ে চিত্তকার্পণ্যের পরিচায়ক নানা অসুন্দর ঘটনা ও দৃশ্যাদির সাক্ষাৎ পাওয়া আশ্চর্য নয় কিন্তু অমন অনুন্নত পরিবেশের ভিতর এত প্রাণের সম্পদ কেমন করে থাকতে পারে সে একটা রহস্য। বিশেষ করে নারীচরিত্রগুলিতে লেখক যে প্রাণের ঐশ্বর্য পরিস্ফুট করে তুলেছেন তার কোন তুলনা হয়

না। শুভদা, বিরাজ, পার্বতী (দেবদাস), সরযূ (চন্দ্রনাথ), সিদ্ধেশ্বরী (নিষ্কৃতি), হেমাঙ্গিনী (মেজদিদি), রমা ও জ্যাঠাইমা (পল্লীসমাজ), পোড়াকাঠ (অরক্ষণীয়া), কুসুম (পণ্ডিতমশাই), ষোড়শী (দেনা-পাওনা), সৌদামিনী (স্বামী), মৃণাল (গৃহদাহ), সুনন্দা (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব) প্রভৃতি চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে গ্রন্থকার বাংলার পল্লীবাসিনী নারীর কোন না কোন একটি মহত্ত্বের দিক প্রকটিত করেছেন। অথচ যে-আবহাওয়ায় তাদের স্থিতি ও গতি, তা কতই না পশ্চাৎপদ। বৃহত্তর পৃথিবীর কোন আলোই সেখানে ঢুকতে পায় না, এমনকি কলকাতার সমাজ-সংস্কার কিংবা স্বদেশী আন্দোলনের এতটুকু কল্লোলও গ্রামজীবনের নিস্তরঙ্গ অবস্থাকে আলোড়িত করেছে তার প্রমাণ মেলে না, শিক্ষাদীক্ষার ন্যূনতম আয়োজনও বলতে গেলে অনুপস্থিত—এমন হতদশাগ্রস্ত মলিন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নারীহৃদয়ে এত মাধুর্য করুণা সহনশীলতা সেবার নিষ্ঠা কী করে সঞ্চিত থাকে ভেবে পাওয়া যায় না। বোধহয় সমাজপরিবেশের ওই পশ্চাৎমুখীনতার কারণেই থাকে। শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত গ্রামীণ নারীচরিত্রগুলি গ্রামের পশ্চাৎপদ পরিবেশ সত্ত্বেও মহীয়সী এ রকম বললে ঠিক বলা হবে না, তারা পশ্চাৎপদ পরিবেশের কারণেই মহীয়সী—এ রকম বলাটাই বোধহয় ঠিক। কেননা গ্রামে আধুনিক শিক্ষার প্রভাব ছড়িয়ে পড়লে গ্রামগুলির ওই চেহারা ও গ্রামীণ নারীচরিত্রসমূহের অমনতর আদল থাকত কিনা সন্দেহ।

আমি আমার 'সমাজ-চেতনা' প্রবন্ধে দেখিয়েছি এখানেও তার পুনরাবৃত্তি করছি যে, শিল্পসৃষ্টির এ এক বিচিত্র খেয়াল যে, রক্ষণশীল তথা সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশের পৃষ্ঠপটে রচিত শরৎচন্দ্রের গ্রামীণ উপন্যাসগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। এই অসম্ভব সংঘটন কেমন করে সংঘটিত হয় জানি না, কিন্তু সংঘটিত হয় এইটেই পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা। অন্ততঃ শরৎচন্দ্রের বেলায় আমাদের পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা। পল্লীসমাজ ও নিষ্কৃতি শরৎচন্দ্রের দুটি অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস। (প্রসঙ্গতঃ লিখি, কাব্য ও সাহিত্যের সপ্তসিন্ধুমন্থনকারী যোগী শ্রীঅরবিন্দ নিষ্কৃতিকে শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছেন। দিলীপকুমার রায়কে লিখিত শরৎচন্দ্রের পত্র দ্রষ্টব্য।) মনস্তত্ত্ব চিত্রণের ক্ষেত্রে পণ্ডিতমশাই ও দেনা-পাওনা উপন্যাসের উৎকর্ষ স্বতঃই মনে পড়ে। মায়ের কলঙ্কের অজুহাতে স্বামিগৃহ থেকে পরিত্যক্ত হওয়ার আহত অভিমানে কুসুমের আত্মমর্যাদাবোধের স্ফুরণ কিংবা চণ্ডীমন্দিরের ভৈরবী পদে সমাসীন

হবার পরও ষোড়শীর স্বামিত্বের আদর্শের পায়ে উৎসর্গীকৃত ভারতীয় বিবাহিতা নারীর পত্নীত্বের সংস্কার দ্বারা মথিত হওয়ায় অন্তর্সংঘাত জটিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের উন্মোচন চেষ্টার দুটি কুশলী নিদর্শন। দুটি নারীর অন্তর্দ্বন্দ্বই মাতৃত্বের ক্ষুধাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। কুসুমের কাছে বৃন্দাবন যেন উপলক্ষ্য, আসল লক্ষ্য বৃন্দাবনের মাতৃহারা সন্তান চরণের প্রতি বাৎসল্যরসের পরিতৃপ্তি। বীজগায়ের জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী যত বড় মদ্যপ আর লম্পটই হোক না কেন, যেহেতু তারই সঙ্গে একদা অলকার (ষোড়শীর গৃহাশ্রমের নাম) বিয়ে হয়েছিল, ষোড়শী সে-স্মৃতি কোনমতেই ভুলতে পারে না। বিয়ের রাতেই স্ত্রীকে ফেলে স্বামী পালায়। তারপর দীর্ঘকালের অদর্শনের পর সম্পূর্ণ নূতন প্রতিবেশে স্বামীর সঙ্গে ষোড়শীর সাক্ষাৎ। শরৎচন্দ্র যে একজন কত বড় নিপুণ মনস্তাত্ত্বিক লেখক পণ্ডিতমশাই ও দেনা-পাওনা উপন্যাসে তার অসংশয় ছাপ পড়েছে। অনেকে এই প্রসঙ্গে পল্লীসমাজের রমা চরিত্রের নামোল্লেখ করবেন। কিন্তু এই চরিত্রে মনস্তত্ত্বের চিত্রণ তত উজ্জ্বল নয় যতটা দেখানো হয়েছে ব্যক্তিমনের উপর সামাজিক অনুশাসনের উৎপীড়নের দ্বন্দ্ব। বিধবার প্রেম সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেম। সেই প্রেম বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে উজ্জীবিত হলেও নিষেধ-বিধির কঠোরতার হ্রাস হয় না। রমা ও রমেশের প্রেম শেষোক্ত গোত্রের প্রেম। কিন্তু রমার অন্তর্দ্বন্দ্বের চেয়েও রমার জীবন ব্যর্থ হওয়ার পরিণামটাই বেশী ফুটেছে এই উপন্যাসে। সার্থক একটি উপন্যাস কিন্তু এটিকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বললে সংজ্ঞানিরূপণ যথার্থ হবে না।

শরৎচন্দ্র শহরের পটভূমিতে যে সব উপন্যাস লিখেছেন তাদের গঠন-বৈশিষ্ট্যের ভিতর মননশীলতার দীপ্তি রয়েছে, স্টাইলের ঔজ্জ্বল্য রয়েছে, মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক প্রগতিশীল, বিদ্রোহী, এমনকি বিপ্লবী আদর্শের ঘোষণা আছে কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির স্বাভাবিকত্বে নাগরিক উপন্যাসগুলি গ্রামীণ উপন্যাসগুলির পাশে দাঁড়াতে পারে না। পথের দাবী কিংবা শেষ প্রশ্নের কথা ধরা যাক। দুটি উপন্যাসেই সংস্কারমুক্ত অগ্রসর চিন্তার পরিচায়ক অনেক মনোমুগ্ধকর কথার ফুলঝুরি ছিটানো হয়েছে কিন্তু চরিত্র-গুলি যেন কেমন দানা বাঁধতে পারেনি। চরিত্রগুলির কথার বৈদগ্ধ্যের আড়ালে চরিত্রগুলির স্বভাবানুগতা হারিয়ে গিয়েছে। চরিত্রগুলির কথার বুদ্ধির দীপ্তি চরিত্রগুলির হৃদয়ের উত্তাপ শুষে নিয়েছে। সব্যসাচীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল একটি অত্যুজ্জ্বল বৈপ্লবিক চরিত্র রূপে, কিন্তু শেষ

অবধি নানা গালভরা কথার বাহন হওয়া সত্ত্বেও কেমন যেন সে মিইয়ে গেছে। উপন্যাসের মধ্যে ও শেষাংশে তাকে বিপ্লবী চরিত্র রূপে পাই না, পাই অপূর্ব ও ভারতীর প্রেমের সমস্যার ফয়সালাকরণে ব্যস্ত মূলতঃ এক মানবিক চরিত্র রূপে। এই যদি লেখকের মনে ছিল তো এমন ঘটা ও আয়োজন করে গেঁজেল মিস্ত্রী গিরিশ মহাপাত্র রূপে তাকে রেঙ্গুনের জাহাজ-ঘাটায় অবতারণা করার কোনই প্রয়োজন ছিল না। পথের দাবী উপন্যাস 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'র একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

অন্যপক্ষে শেষ প্রশ্নের কমল চমক-লাগানো কথার একটি পিপে বিশেষ। তার মুখে সাংঘাতিক সাংঘাতিক কথা লেগেই আছে। সে পাশ্চাত্ত্য সুখবাদী দর্শন ক্ষণিক তত্ত্বে বিশ্বাসী, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবহমান-কাল প্রচলিত মূল্যবোধগুলিকে সে কানাকড়ির মূল্যও দেয় না, দাম্পত্য বন্ধনের স্থায়িত্ব অপেক্ষা দাম্পত্য প্রেমের ক্ষণকালীন নিবিড়তায় তার আস্থা অধিক। এই সব আপাত-পিলে-চমকে-দেওয়া মতামতের অভিব্যক্তি দিতে গিয়ে তার মুখে কথার খই ফুটছেই শুধু ফুটছে। কিন্তু মানুষটি কেমন যেন বড় নিরামিষ। কথার সঙ্গে আচরণের তেমন মিল নেই। তার উপর কতকগুলি প্রবাসী বাঙালী অবসরভোগী শান্তিপ্রিয় নিরীহ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তার ক্রমিক বিচরণ তার বৈপ্লবিকতায় সন্দেহ জাগায়। কথায় বিপ্লবী অনেকেই সাজতে পারে কিন্তু শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। ভেজে না যে তার প্রমাণ রাজেনের মত সত্যিকারের বিপ্লবী পরদুঃখকাতর নির্ভীক যুবকের সান্নিধ্যে এসে কমল একেবারেই মিইয়ে গেল। রাজেনের কাছে কমলের পরাজয় ঘটলো। রাজেন স্বল্পবাক্ কিন্তু কাজে অমিতবিক্রম। পাছে তার কাজের ব্যাঘাত ঘটে সেইজন্য নারীর ছলাকলা-বিভ্রমকে সে তার কাছ ঘেঁষতেও দেয় না। উপন্যাসের উপসংহারে দেখানো হয়েছে একটি বিপন্ন পরিবারকে আগুন থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে সে তার প্রাণ বিসর্জন দিলে। এহেন বলিষ্ঠ তেজস্বী আদর্শনিষ্ঠ যুবার কাছে কমলের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি কিন্তু কথামাত্রসার নারীর পরাজয় না ঘটে কি পারে?

শরৎচন্দ্রের নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি তাঁর গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির মত শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়ে তেমন খোলেনি তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, শরৎচন্দ্রের গ্রামজীবনের সঙ্গে যেমন গভীর ও অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল, তেমন শহরজীবনের সঙ্গে ছিল না। সত্য বটে তিনি স্কুলজীবনে ভাগলপুর,

যৌবনে কিছুকাল কলকাতা, পরে রেঙ্গুন শহরে এক যুগেরও বেশী বাস করেছিলেন, তাহলেও প্রথম বয়সের দেখা বাংলার গ্রাম তাঁর স্মৃতির মধ্যে সংগ্রথিত হয়ে গিয়েছিল। আমৃত্যু তিনি এই স্মৃতিভার নিজের মধ্যে বহন করেছেন। গ্রামকে তিনি যত কাছে থেকে দেখেছিলেন, শহরকে তেমন করে কাছে থেকে দেখার তাঁর সুযোগ হয়নি। সেইজন্যই গ্রাম তাঁর লেখায় শিল্পীর অপূর্ব তুলিকাপাতে মহনীয় হয়ে উঠেছে।

বাংলার গ্রামের সঙ্গে তাঁর এই এককালীন নিবিড় অন্তরঙ্গতা তাঁর রচনার শক্তিমত্তারও যেমন উৎস, আবার এক হিসাবে দেখতে গেলে দুর্বলতারও উৎস। শরৎচন্দ্রের চিন্তার ছাঁচের মধ্যে শেষ বয়স অবধি একটা রক্ষণশীলতার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর অমোচনীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, ছোঁয়াছুঁয়ি-জাত-বিচার নিয়ে অতিরিক্ত খুঁতখুঁতে বাতিক, এই রক্ষণশীলতার আওতায় পড়ে। এটা নিশ্চিতই চিন্তার এক পশ্চাৎ-টান। এই পশ্চাৎ-টানের মূল খুঁজতে গেলে বাল্যের গ্রামীণ সংস্কারের মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। বাল্যের সংস্কার তাঁর মনোমধ্যে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে সংলগ্ন হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি চেষ্টা করেও পরিণত জীবনে সেই পেছুটানের প্রভাব মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি। তা-ই যদি না হবে তো এই অবিশ্বাস্য ব্যাপার কেমন করে সম্ভব হয় যে, যিনি চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব, গৃহদাহ, পথের দাবী, শেষ প্রশ্নের মত দৃশ্যতঃ সংস্কারমুক্ত সব বই লিখেছেন, শেষ বয়সে তিনিই আবার বিপ্লবী আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে বিপ্রদাস ও শেষের পরিচয়-এর মত দুটি সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল উপন্যাস লিখতে পারলেন? বিপ্রদাসের মূল প্রতিবাদ্য কী? আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার প্রচ্ছন্ন সমালোচনা নয় কি? গ্রামের যৌথ পরিবার-প্রথার কল্পিত মহত্ত্ব, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মহিমা, প্রজানুরঞ্জনের পরিবর্তে জবরদস্ত হাতে জমিদারী শাসনের প্রয়োজনীয়তা, অভিভাবক কর্তৃক কন্যার বরনির্বাচনের যৌক্তিকতা—এসব দেখানোই কি এই অন্যথা-সুলিখিত উপন্যাসটির মূল উদ্দেশ্য নয়? বন্দনা তার আধুনিক শিক্ষার যত্নার্জিত সম্পদকে ত্যাগ করে গ্রামের একান্নবর্তী জমিদারী সংসারের রক্ষণশীল পারিবারিক বন্ধন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিল—এই চিত্রের ভিতর কোন্ প্রগতিশীলতার বার্তা ঘোষিত হয়েছে? বিপ্রদাসের সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হওয়ার মধ্যে চরিত্রমাহাত্ম্য থাকতে পারে কিন্তু তার সমগ্র জীবন-দর্শনটাই যে রক্ষণশীলতার চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা কি একালের

ভাবধারায় লালিত পাঠক-পাঠিকাকে বুঝিয়ে বলবার আবশ্যকতা আছে? আর শেষের পরিচয় উপন্যাসটি তো বৈষ্ণব বিগ্রহের অন্তহীন পূজাঅর্চনার এক অপরিসীম ক্লান্তিকর ইতিবৃত্ত মাত্র। বেশ বুঝতে পারা যায় শরৎচন্দ্রের সৃজনী আবেগ এই বইয়ের রচনাকালে একেবারেই তলানিতে এসে ঠেকেছিল। ঐতিহ্যলালিত গতানুগতিক হিন্দুমনের কাছে এই উপন্যাসের কাহিনীর আবেদন থাকতে পারে কিন্তু আধুনিক পাঠকের কাছে নয়।

যাই হোক, যে-কথা বলছিলাম। নগরভিত্তিক উপন্যাসগুলির অন্য অনেক অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও গৃহদাহ উপন্যাসটি কিন্তু চমৎকার উৎরেছে। সমালোচকদের মতে এটি শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস; কেউ কেউ এটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আখ্যা দিতে চান। উপন্যাসটির নিটোল গড়ন, আধুনিককালীন পাঠকের মনোযোগকে সবলে আকর্ষণ করার মত উপযুক্ত বিষয়বস্তুর সমাবেশ, চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নিপুণ বিশ্লেষণ স্বতঃই এটিকে শিল্পোৎকর্ষমণ্ডিত করে তুলেছে। কাজেই এই উপন্যাসটির যৎকিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন।

গৃহদাহ একটি ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী। মহিম, অচলা ও সুরেশ এই তিনে মিলে ত্রিকোণ রচিত হয়েছে। মহিম ও অচলা পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। অচলারা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বলে গোড়ার দিকে অচলাদের সমাজের প্রতি মহিমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুরেশের বিতৃষ্ণার অন্ত ছিল না এবং মহিম যাতে এই বিবাহ না করে তার জন্য সুরেশ চেষ্টার কসুর করেনি। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে নিজেই সুরেশ শেষ পর্যন্ত অচলার আকর্ষণে মুগ্ধ হলো এবং ব্রাহ্মদের প্রতি তার পূর্বতন বিদ্বেষ কাটিয়ে ঘন ঘন অচলার পিতৃগৃহে উৎপাতের মত দেখা দিতে লাগলো। অনাহূত সে মহিমের গাঁয়ের বাড়িতেও গিয়ে উপস্থিত হলো, যেখানে মহিম তার সদ্যবিবাহিত পত্নীকে নিয়ে সবে সংসার পেতে বসেছে। সুরেশ ধনীসন্তান, উদারপ্রাণ, নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও সে দুই-দুবার মহিমকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছে, কিন্তু তার স্বভাবের প্রধান ত্রুটি এইখানে যে, সে আত্মসংযমে অপারগ। প্রবৃত্তির চালনায় তার দ্বারা যে কোন অঘটন ঘটা সম্ভব। আর শেষ অবধি সেই অঘটন ঘটলোও। এই উপন্যাসের 'গৃহদাহ' নাম বাস্তব এবং রূপক দুই অর্থেই যথাপ্রযুক্ত। সুরেশের অন্ধ আকর্ষণের কামবহ্নিতে মহিম ও অচলার সদ্যরচিত গৃহস্থালী পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

মহিমের স্বভাব সুরেশের সম্পূর্ণ বিপরীত। গভীর-গম্ভীর, স্বল্পবাক্, কর্তব্যনিষ্ঠ, আঘাতের বদলে প্রতিঘাতে অশক্ত ও নীরব দুঃখসহনে সদা-অভ্যস্ত এবং সর্বোপরি অচলার প্রতি নিবিড় প্রেমে প্রেমময় হয়েও বাইরে প্রেমের প্রকাশে সসংকোচ, সর্বদা স্বভাব-সংযমের বর্মে আবৃত—এই হলো মহিম। অচলা এই দুই বিপরীত প্রকৃতির টানা-পোড়েনের মধ্যে পড়ে দিশেহারা। একদিকে মহিমের আত্মবিলোপকারী গভীর প্রেমের প্রবল টান সে অস্বীকার করতে পারে না, অন্যদিকে সুরেশের প্রাণোচ্ছলতা, হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য, পার্থিব ধনৈশ্বর্যের আকর্ষণ—এগুলিও তাকে দুর্নিবার টানে টানে। (ধনসম্পদের প্রতি নাকি ব্রাহ্মদের একটু দুর্বলতা আছে—এই অভিযোগের কতদূর ভিত্তি আছে বলা মুশকিল, তবে দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্র এই অভিযোগের সুযোগ নিয়ে অচলা ও অচলার পিতা কেদারবাবুকে ওই দুর্বলতার শিকার করে এঁকেছেন। এটা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণচিত্ততার কোঠায় পড়ে—শরৎচন্দ্রের মজ্জাগত ব্রাহ্মণ্য সংস্কারেরই এটি একটি রকমফের কিনা তা একটা প্রশ্নচিহ্ন হয়েই রইল।) শেষ পর্যন্ত দুই বিপ্রতীপ আকর্ষণের আলোড়নে-বিলোড়নে ক্ষতবিক্ষত হয়ে একসময়ে আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে সে সুরেশকে বলেই ফেলে, সুরেশবাবু, যাকে ভালবাসিনে তার সঙ্গে ঘর করার যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করে আমায় আর কোথাও নিয়ে চলুন। এই সদম্ভ উক্তি মহিমের প্রতি এবং অচলার নিজের অন্তর-প্রবৃত্তির প্রতিও যে কত বড় অবিচার, অচলা সেই বিস্মরণের মুহূর্তে সে-কথা বোঝেনি, বুঝেছিল পরে, অনেক দুঃখের মূল্যে, অজস্র চোখের জলের ভিতর দিয়ে।

উপন্যাসটির বিষয়বস্তু কিছু নতুন নয়। এদেশে এবং বিদেশে একাধিক উপন্যাস ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে এই বিষয়বস্তুর উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ একটি দৃষ্টান্তস্থল রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে। বিশ্বসাহিত্যের যে সব উপন্যাসের ভিতর অনুরূপ বিষয়বস্তুর চিত্রণ আছে তার মধ্যে পড়ে—টলস্টয়ের আনা ক্যারেনিনা, টমাস হার্ডির জুড দ্য অবসকিউর, এইচ. জি. ওয়েলস-এর দ্য ওয়াইফ অব সার আইজাক হ্যামিলটন, গলসওয়ার্দির ফরসাইট সাগা (সোমস-আইরিন-ফিলিপ পর্ব), আনাতোল ফ্রাঁসের রেড লিলি, প্রভৃতি। শরৎচন্দ্র এই সমস্ত উপন্যাস পড়েছিলেন কিনা, পড়ে থাকলে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা জানা যায় না তবে ঘরে-বাইরে তিনি বিশেষ মনোযোগ

সহকারে পড়েছিলেন সে কথা সহজেই বোঝা যায়। দুই উপন্যাসের প্রকাশকালের মধ্যেও পার্থক্য খুব কম। মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধান। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র-রচিত প্রতিটি উপন্যাসই অতিশয় তন্ন তন্ন করে পড়েছিলেন।

তবে ঘরে-বাইরের সঙ্গে গৃহদাহের বহিরঙ্গে যতই মিল থাকুক, অন্তরঙ্গে মিলের চেয়ে অমিল বেশী। নিখিলেশের চরিত্র মহিমের চেয়েও অনেক বেশী মহান্। তদুপরি সে সূক্ষ্ম কবিস্বভাব বিশিষ্ট, মহিমে কবিত্বের সংবেদনশীলতা অনুপস্থিত। সন্দীপ সচেতন স্থূল কামনার দ্বারা বিমলাকে অধিগত করতে চায় এবং তার পরিকল্পনার মধ্যে ভালবাসার কোন স্থান নেই, লালসাই তার আকর্ষণের চালিকা শক্তি। পক্ষান্তরে সুরেশ প্রবৃত্তি চালিত যুবক হলেও যেই মুহূর্তে বুঝলো অচলা তাকে অন্তর থেকে ভালবাসেনি, তার আসল ভালবাসা পড়ে রয়েছে মহিমের অভিমুখে, তন্মুহূর্তে সে তার ভুল বুঝতে পেরে অচলার কাছ থেকে আপনাকে সংবৃত করে স্বেচ্ছামৃত্যুর দিকে পা বাড়ালো। সন্দীপ সচেতন পাপী, সুরেশের পাপের ভিতর আছে অচলাকে বুঝতে না পারার স্বভাব-সারল্য। একজন জবরদস্তির নীতিতে বা অনীতিতে বিশ্বাসী ; অন্যজন জবরদস্তি-পাওয়া থেকে স্বেচ্ছায় হাত গুটিয়ে নিলে। অচলার চরিত্রে সচ্ছলতার মোহ দেখানো হয়েছে ; বিমলার পক্ষে সচ্ছলতার হাতছানিতে আকৃষ্ট হবার কোনই কারণ নেই কেননা তার স্বামী জমিদার, তাদের নিজের গৃহই বিত্ত-সচ্ছলতার প্রতীক। অবশ্য আত্মবিস্মৃতির ধরনে দুজনার মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে।

মোট কথা, সব জড়িয়ে বিচার করলে গৃহদাহ যে একটি বিশেষ সুলিখিত উপন্যাস সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না।

শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন আর একটি শক্তিশালী উপন্যাস। এই উপন্যাসের দুটি কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র। সাবিত্রী ও কিরণময়ী। তুলনায় কিরণময়ী অনেক বেশী ব্যক্তিত্বসম্পন্না, প্রখরবুদ্ধিশালিনী, আত্মসচেতন নারী। সাবিত্রীকে মূলতঃ একটি প্রেমময়ী সহনশীলা সেবাপরায়ণা নারী রূপে আঁকা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু তার চরিত্রে একদা নাকি কলঙ্ক স্পর্শ করেছিল এবং সে পরিচারিকার কাজ করে, সেই কারণে তাকে আর ভদ্র সমাজের আওতার মধ্যে আনাই হলো না, তাকে তার সেবার আদর্শ মাথায় ধরে সমাজের বাইরেই জীবন কাটাতে হলো। সতীশ ও সরোজিনীর দাম্পত্য বন্ধনের যূপমূলে সে আপনাকে উৎসর্গ করে সকলের মনোযোগের বৃত্ত থেকে

নীরবে সরে গেল, মৃত্যুপথযাত্রী উপেন্দ্রের শেষ দিনগুলির সেবার ভার নিয়ে ॥

এই ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্র রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। সামাজিক প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্রকে রক্ষণশীল বলা সমালোচকদের মধ্যে একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দেখা যায় শরৎচন্দ্র বঙ্কিমের অনেক পরে জন্ম গ্রহণ করেও গুরুত্বপূর্ণ একাধিক প্রশ্নে বঙ্কিমের অনুবর্তী হয়েই চলেছেন—বঙ্কিমের চেয়ে খুব বেশী উদার মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেননি। সতীশের সঙ্গে সাবিত্রীর বিয়ে হওয়াটাই প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু কোন্ এক ধনীকন্যা ব্যারিস্টারের ভগিনী কুলেশীলে সতীশদের সমান ঘরের পাত্রীর অনুকূলে আপন দাবি ত্যাগ করে সাবিত্রীকে চিরকাল দাসীবৃত্তি করেই যেতে হলো—তার অপরিমেয় ভালবাসার কোন মূল্যই লেখক দিলেন না। 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও সরিয়ে দেয়'—এই উক্তি শরৎচন্দ্রের। কিন্তু দেখা গেল এই আপ্তবাক্য শুধু বঞ্চিতা, পতিতা শ্রেণীর নারীদের জন্যই তোলা রইল ; উচ্চবর্ণের নারীর জন্য অন্য বিধান, অন্য পাঁতি সংরক্ষিত থাকলো।

কিরণময়ী চরিত্রের বিশ্লেষণ আমি এই বইয়ের অন্যত্র করেছি। (উপক্রমণিকা ও 'নারীচরিত্র' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) কাজেই এখানে আর তার পুনরুক্তি করলুম না। তবে পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েও একথা বারবার বলতে হবে, কিরণময়ী বাংলা সাহিত্যের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। বাংলা উপন্যাসে এ চরিত্রের কোন দোসর নেই—আগেও ছিল না, আজও নেই।

শরৎচন্দ্রের আর একটি বিশিষ্ট শিল্পকীর্তি শ্রীকান্ত উপন্যাস পর্যায়। চার পর্বে এই পর্যায় সমাপ্ত। অনেকে বলেন এটি শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনী—জায়গায় জায়গায় কল্পনার মিশোল দেওয়া। হতেও পারে, কেননা উপন্যাসচতুষ্টয়ের কিছু-কিছু আখ্যান ও বিবৃতি শরৎচন্দ্রের জীবনীর ছাঁচটিকে মনে করিয়ে দেয়। প্রথম পর্বের ভাগলপুরের কৈশোর-কথা, দ্বিতীয় পর্বের বর্মা প্রবাস, শ্রীকান্তের সন্ন্যাসীর চ্যালাগিরি করা—এ সব স্পষ্টতঃই লেখকের নিজ জীবনের স্মারক। তবে শ্রীকান্ত উপন্যাসমালা আত্মকথাই হোক আর কল্পকথাই হোক এটি যে একটি বিশেষ শক্তিশালী রচনা সে বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ নেই।

প্রথম পর্বের দুটি উজ্জ্বল চরিত্র ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদি। দ্বিতীয় পর্বের সবচেয়ে স্মরণীয় চরিত্র অভয়া। তৃতীয় পর্বে সুনন্দা, বজ্রানন্দ ও অগ্রদানী

ব্রাহ্মণ দম্পতী। চতুর্থ পর্বে কমললতা ও গহর। আর প্রতিটি পর্বে স্থায়ী একটি সুরের মত রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলাযুক্ত ভালবাসার কাহিনী অন্তহীন স্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

প্রথম পর্বের ইন্দ্রনাথ একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। ইন্দ্রনাথ দুর্দান্ত গোঁয়ার ভয়হীন কিন্তু মনটি তার মায়ের প্রাণের মত কোমল। সে মানুষের দুঃখ সইতে পারে না আর কারও দুঃখের মুখোমুখি হয়ে সে-দুঃখের শান্তি না হওয়া পর্যন্ত সে নিজের প্রাণে কোন শান্তি পায় না। অন্নদাদিদির সংসারের অভাব মোচনের জন্য তার প্রাণপাত প্রয়াস তার চরিত্রটিকে একটা বিরল মহিমায় ভূষিত করেছে। বিপন্নকে রক্ষা করতেও তার সমান তৎপরতা। গুণ্ডাদের আক্রমণ থেকে শ্রীকান্তকে রক্ষা করবার জন্য সে যেভাবে আপন প্রাণ তুচ্ছ করে বুক দিয়ে এগিয়ে এসেছিল তাইতে শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের চিরকালের কেনা হয়ে পড়েছিল এবং তার পর থেকে সকল কাজে তাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করেছে। অন্ধকার নিশীথে গঙ্গায় মাছ চুরির ঘটনা ইন্দ্রনাথ চরিত্রটির সমস্ত বৈশিষ্ট্য যেন একটি ঘটনার আধারে সংহত করে উপস্থিত করেছে। তার একাকী শ্মশানচারিতার মধ্যে পাওয়া যায় একই ধরনের অসংশয়-আত্মনির্ভর অকুতোভয়তার নিশানা। আশ্চর্য চরিত্র এই ইন্দ্রনাথ। চার খণ্ডে সমাপ্ত শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রাথমিক অধ্যায়ে মাত্র কিছুকালের জন্য তার আবির্ভাব ও অবস্থিতি। কিন্তু ওই ক্ষণিকের আত্মপ্রকাশের দ্বারাই সে গোটা উপন্যাসমালার উপর একটা অমোচনীয় প্রভাব বিস্তার করেছে। এবং সমগ্র উপন্যাসের মূল সুরটি বেঁধে দিয়েছে। সে সুর হলো বিদ্রোহের, বাঁধন ছেঁড়ার, শাসননাশন প্রবৃত্তির। শুনতে পাওয়া যায় বাস্তব জীবনের যে-চরিত্রটির আদলে ইন্দ্রনাথের চরিত্র পরিকল্পিত হয়েছিল সে পরে সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ছেড়ে চলে যায়। সেটা বিচিত্র নয়। দুর্দমনীয় আবেগ আর দুঃসাহসিকতায় ভরা এমন যে গোঁয়ার-গোবিন্দ চরিত্র, সে যদি বাস্তব জীবনে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেই যায়, তাকে মোটেই অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলে মনে হয় না। এমন চরিত্রের এরূপ পরিণামই কল্পনীয়। সংসার এমন চরিত্রকে তার আপন সংকীর্ণ গণ্ডীতে বেঁধে রাখতে পারবে তার ,সাধ্য কী।

অন্নদাদিদি চরিত্রে ভারতীয় নারীর প্রবাদবিদিত সহনশীলতা ও স্বামী-আনুগত্যের একটি বেদনাকরুণ মর্মস্পর্শী চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

অন্নদাদিদির স্বামী একটি নির্জলা পাষণ্ড, তৎসত্ত্বেও অন্নদাদিদি তাকে সব অবস্থায় ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করেছে, এমনকি স্বামীর জন্য জাত দিয়েছে। জন্মেছিল হিন্দু উচ্চকুলে, কপালদোষে হয়েছে মুসলমান সাপুড়ের ঘরণী সাপুড়ানী, সাপ ধরে ও সাপ খেলিয়ে দুজনার জীবিকার উপায় হয়। তাও আসল সাপুড়ে নয়, হত্যার দায় এড়াবার জন্য পুলিশের চোখে ধুলো দেবার উদ্দেশ্যে লম্পট স্বামী নাম ভাঁড়িয়ে সাপুড়ে সেজেছিল। পতির ধর্মই স্ত্রীর ধর্ম, এই মজ্জাগত সংস্কার বশে স্ত্রী ধর্ম পরিবর্তনে মুহূর্তেকের দ্বিধা করেনি। কিন্তু এততেও অন্নদার দুঃখের শেষ হয়নি। নেশায় বেহুঁশ হয়ে শাহজী প্রায়ই অন্নদাকে মারধোর করত, আর অকথ্য গালিগালাজ তো লেগেই ছিল। তা সত্ত্বেও লাঞ্ছিতা নিপীড়িতা নারী স্বামী ত্যাগ করেনি। ইন্দ্রনাথদের অঞ্চল থেকে বাস তুলে নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার প্রাক্কালে অন্নদা তার প্রাণের ভাই ইন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখে গিয়েছিল তার ভাষা বেদনার্ত হৃদয়ের রক্তে রঞ্জিত। বাস্তবে এমন চরিত্র সম্ভব কিনা জানি না, তবে বাস্তব কখনও কখনও কল্পনাকেও হার মানায়। সুতরাং কিছুই বলা যায় না।

দ্বিতীয় পর্বের অভয়ার সম্বন্ধে এই বইয়ের অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। ('সমাজ-চেতনা' ও 'নারীচরিত্র' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) তৃতীয় পর্বের সুনন্দা একটি নির্ভীক আদর্শনিষ্ঠ অন্যায়-প্রতিরোধী চরিত্র। তার ভাসুর ঠাকুর অন্যথা-মানার্হ হলেও এক বিধবা গরিব তাঁতি-বৌয়ের মাথা গোঁজবার ভিটেমাটি ও জমিজমা মিথ্যা দেনার দায়ে নিলেম করিয়ে আত্মসাৎ করেছিলেন। সেই জ্বলজ্যান্ত অন্যায়ের প্রতিবাদে সুনন্দা তাঁর স্বামী ও শিশুপুত্রসহ একান্নবর্তী ভাসুর-গৃহ ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় কঠিন দারিদ্র্য বরণ করে নিলে। তৃতীয় পর্বের অগ্রদানী ব্রাহ্মণ দম্পতীর আলেখ্যটিও সুন্দর। তারা সীমাহীন অভাব-অনশনের মধ্যেও তাদের হৃদয়ের সহজাত মায়া-মমতার বৃত্তি হারায়নি। বিশেষ, ব্রাহ্মণীর আপাত-রুক্ষ বহিঃপ্রকৃতির অন্তরালে ফল্গুধারার ন্যায় বহমান সেবা ও মমতার চিত্রটি গভীরভাবে হৃদয় স্পর্শ করে। এটি শ্রীকান্ত উপন্যাসের নিতান্তই একটি পার্শ্ব-উপাখ্যান। কিন্তু শুধু দরিদ্রের হৃদয়ের ঐশ্বর্য দেখানোই এর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সেই সঙ্গে অন্যায় সামাজিক শাসন ও উৎপীড়নে কেমন করে হিন্দু সমাজের কাঠামো ক্রমক্ষয়িষ্ণু হয়ে জীর্ণতার শেষদশায় এসে পৌঁচেছে তারও একটি মর্মান্তিক ছবি এই উপ-কাহিনীর মধ্যে মেলে।

চতুর্থ পর্বের কমললতা বৈষ্ণবীর চরিত্রটি সুন্দর। কেমন করে, কোন্ অবস্থায়, বৈষ্ণব সাধন-ভজনের পথে সে এলো, এসে শ্রীকৃষ্ণে সর্ব-সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছে, তার বৃত্তান্ত সমাজের একটি স্বল্প-পরিজ্ঞাত দিকের বাস্তবতাকে উদ্‌ঘাটিত করে। ধনীসন্তান কিন্তু স্বভাবে উদাসী মুসলমান কবি গহরের কমললতার প্রতি নীরব প্রেমের মাধুর্য ও সৌন্দর্য দুই-ই চিত্ত-স্পর্শী। মুসলমান চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে কম। এই চরিত্রটি তার ব্যতিক্রম। এমন আরও কিছু চরিত্র শরৎচন্দ্র সৃষ্টি করে যেতেন তো মুসলিম পাঠক সমাজের কাছে তাঁর আবেদন আরও নৈকট্যমণ্ডিত হতে পারতো।

কিন্তু পর্বের পর পর্ব জুড়ে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত প্রণয়োপাখ্যানের অতি-সবিস্তার, প্রায়-অন্তহীন, বর্ণন শ্রীকান্ত বইয়ের পর্বগুলিকে কিছুটা বাহুল্য-ভারাক্রান্ত করেছে, সে কথা সম্যক্‌দর্শী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। সাধারণ পাঠকের নিকট যে-কোন রকমের প্রেমকাহিনীর দুর্নিবার আকর্ষণ থাকলেও, এই প্রেমকাহিনীটির এমনতর অতিফেনায়িত পৌনঃ-পুনিক বর্ণনের কী আবশ্যকতা ছিল ভাল বুঝতে পারা যায় না। এক এক সময় শ্রীকান্তকে ঘিরে রাজলক্ষ্মীর আশঙ্কা ও উদ্বেগের উচ্ছ্বাস রীতিমত ক্লান্তিকর ঠেকে। তাছাড়া, এই কাহিনীর সামাজিক তাৎপর্যও তেমন স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। একটি শক্ত-সমর্থ কর্মের ক্ষমতাযুক্ত অথচ বাউণ্ডুলে-স্বভাব যুবক দিনের পর দিন পড়ে পড়ে এক বাঈজীর উপার্জনের উপর খাচ্ছে এ বিবরণ সুস্থও নয়, লোকের সামনে ধরে দেওয়ার মত আদর্শ দৃষ্টান্তও নয়। তাছাড়া, কাহিনীটি পুরাপুরি বিশ্বাস্যও বলা যায় না, কাল্পনিক হলেও মূলেতেই সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। কবে কোন্ সুদূর বাল্যে পাঠশালায় পড়বার কালে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তর গলায় বৈঁচী ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিল তারই স্মৃতি আজন্ম বহন করে পরিণত বয়সে পিয়ারী বাঈজী এক চালচুলোহীন ভবঘুরে ভাবুকের পায়ে ঐশ্বর্য সম্পদ সেবা স্বাচ্ছন্দ্য সর্বস্ব সমর্পণ করে দেবে, বাল্যস্মৃতির এতটা সর্বাতিশায়ী শক্তি কল্পনা করে নিলে মানবীয় মনস্তত্ত্বকেই অস্বীকার করা হয়—এমনকি দুজ্ঞেয়া বলে কথিতা নারীর মনস্তত্ত্বের পক্ষেও এ জিনিস বিশ্বাস্য নয়। এই অতিকথনদুষ্ট কাহিনীটি তার সীমাহীন আত্মাদর আর লক্ষ্যহীনতা নিয়ে শ্রীকান্ত উপন্যাস-মালিকার উপর একটা অবাস্তবতা আর অনৈতিকতার বাতাবরণ বিছিয়ে

দিয়েছে। সমালোচকেরা যে যাই বলুন, রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত আখ্যান শ্রীকান্ত উপন্যাসচতুষ্টয়ের শক্তির নিদর্শন নয়, দুর্বলতার নিদর্শন।

উপরে যে সব উপন্যাসের আলোচনা করা হয়েছে সেই সব রচনা বাদে অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাসের সংক্ষেপ-পরিচিতি অর্থাৎ চুম্বক দিচ্ছি। এই সব রচনার কিছু প্রথম বয়সের, কিছু উত্তর কালের।

কাশীনাথ এক অধ্যয়ননিষ্ঠ বিষয়-বিরাগী উদারপ্রাণ যুবকের কাহিনী।

দেবদাস বাল্যপ্রণয়ের অভিশাপে বিপর্যস্ত এক সম্পন্ন গৃহের গ্রাম্য যুবকের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার বিয়োগান্ত কাহিনী। মেলোড্রামাটিক গল্প তবে লেখার গুণে হৃদয়দ্রবকারী।

শুভদা উপন্যাসের নামচরিত্রে ভারতীয় বিবাহিত নারীর যে-সহনশীলতা ও ক্ষমার ছবি ফোটানো হয়েছে তা শুধু একমাত্র সর্বংসহা ধরিত্রীতেই কল্পনীয়।

বড়দিদি এক শিক্ষিত কিন্তু পদে পদে পরনির্ভরশীল যুবকের প্রতি এক বালবিধবার মাতৃকল্প সেবা ও পরিচর্যার গল্প।

বিরাজ বৌ-এর গল্পাংশে ভারতীয় কুলবধূর পতিভক্তি ও সতীত্বের মহিমা প্রকটিত করা হয়েছে। অভাবের দায়ে বিরাজের সাময়িক বিভ্রম ঘটলেও দেহেমনে সে ছিল শুদ্ধা, পতিঅন্তপ্রাণতার এক ভাবাবেগসমৃদ্ধ কাহিনী।

চন্দ্রনাথ বিনা দোষে অথবা সামান্য দোষে স্ত্রীর পতিপরিত্যক্ত হওয়ার কাহিনী। স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলনে গল্পের শেষ। কৈলাসখুড়ো এই উপন্যাসের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র।

মেজদিদি, বিন্দুর ছেলে, নিষ্কৃতি, রামের সুমতি এর প্রত্যেকটিই মাতৃস্নেহের গল্প।

অরক্ষণীয়া, নামেই প্রকাশ, অনূঢ়া কন্যাকে পাত্রস্থ করার সমস্যার কাহিনী।

বামুনের মেয়ের আখ্যানভাগে কৌলিন্য প্রথার সর্বনাশা প্রভাব চিত্রিত হয়েছে।

ছবি, বর্মার পটভূমিতে রচিত এক স্বাদু প্রেমের গল্প।

পরিণীতা একটি মধুর প্রেমের গল্প।

স্বামী আত্মকথার আকারে ভারতীয় নারীর অন্তরে স্বামী নামক আইডিয়ার সূক্ষ্ম কিন্তু সুনিশ্চিত প্রভাবের কাহিনী।

বৈকুণ্ঠের উইল অনাবিল ভ্রাতৃস্নেহের এক অনবদ্য গল্প।

দত্তা প্রেমের গল্প। শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে সুখপাঠ্য উপন্যাস।

॥ ৮ ॥

নারীচরিত্র

শরৎচন্দ্র তাঁর নারীচরিত্রগুলিকে বিশেষ মমতা ও দরদের সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন এ বিষয়ে সকল সমালোচকই একমত। এমনকি যে সব নারী অবস্থাবৈগুণ্যে সমাজের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, পতিতারূপে ধিক্কৃত ও নিন্দিত, তাদেরও তিনি তাঁর সাহিত্যে বিশেষ ঠাঁই দিয়েছেন ও তাদের বেশ সহানুভূতির সঙ্গেই এঁকেছেন। বাংলার নারীকুলের প্রতি শরৎচন্দ্রের এই বিশেষ মমত্বের অভিব্যক্তি শিল্পী হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্যকেই যে শুধু চিহ্নিত করে তাই নয়, তাঁর সমাজ-সচেতন মনটিকেও আমাদের কাছে প্রকাশ করে। তিনি তাঁর বাস্তবজীবনের নানামুখী ব্যাপক অভিজ্ঞতার ফলে বুঝেছিলেন আমাদের এই পুরুষশাসিত সমাজে নারী নানাভাবে নিগৃহীত ও অবহেলিত। মুখে তাঁদের দেবী বললেও আমরা তাঁদের দাসীর অধম জীবনের স্তরে বেঁধে রেখেছি। তাঁদের আদ্যাশক্তির অংশসম্ভূতা বলে স্তব করি কিন্তু কার্যতঃ তাদের স্থূল ভোগ ও সেবালাভের সহজ উপায় ভিন্ন আর কিছু জ্ঞান করিনে। মনুর বিধান নিয়ন্ত্রিত এই অসম-সমাজে স্ত্রীপুরুষের সমানাধিকারের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। মেয়েদের ন্যূনতম ব্যক্তিত্ব বিকাশেরও কোন সুযোগ নেই এ সমাজে। মেয়েদের ব্যথা-বেদনা অভাব-অভিযোগের প্রতি মনোযোগী হওয়া তো পরের কথা, মনোযোগী হওয়াটা যে প্রয়োজন সে খেয়ালও আমাদের নেই।

ভারতীয় সমাজে নারীজাতির প্রতি এই দীর্ঘদিনের অন্যায় শরৎচন্দ্রকে গভীরভাবে বেজেছিল। তাঁর অন্তরটি ছিল সহজাত দরদ ও সমবেদনায় ভরা, তাই তিনি তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে নারীচরিত্রকে বিশেষ যত্ন ও সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন এবং এ কাজে তাঁর সবটুকু প্রাণের আবেগ ঢেলে দিয়েছেন। নারীর প্রতি তাঁর বিশেষ মমত্বের পরিচয় তিনি শুধু তাঁর কথা-সাহিত্যের পরিসরের মধ্যেই সীমিত রাখেননি, এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রবন্ধ সাহিত্যের সাহায্যও গ্রহণ করেছিলেন। দেশে বিদেশে পুরুষ আদিম কাল থেকে এ পর্যন্ত নারীকে কী শোচনীয় অবমাননাকর অবস্থার মধ্যে রেখেছে

তা পরিস্ফুট করে তোলবার জন্য অনিলা দেবীর নামের ছদ্মাবরণে তিনি একদা নারীর মূল্য নামক একখানা গ্রন্থ লিখেছিলেন। বইখানি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পূর্ণ। নারীর প্রতি মনুষ্যসমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্ন দিক উন্মোচন করে এরূপ দশখানা বই লেখবার কথা তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু নানা ব্যস্ততা নিবন্ধন সে-পরিকল্পনা তিনি কার্যান্বিত করে যেতে পারেননি। কিন্তু সে সব বই তিনি লিখুন আর নাই লিখুন, নারী সমস্যা তাঁর অন্তর কতখানি জুড়ে ছিল এই থেকে তার প্রমাণ হয়।

শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত নারীচরিত্রগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা কয়েকটি বিশেষ টাইপের প্রতীক। পরপর এই টাইপগুলির বর্ণনা করছি। (১) স্নেহশীলা মাতৃস্বভাবমণ্ডিতা নারী—বিন্দু, নারায়ণী, বড়দিদি মাধবী, মেজদিদি, জ্যেঠাইমা প্রভৃতি ; (২) সেবাপরায়ণা নারী—মৃণাল, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী প্রভৃতি ; (৩) পতিব্রতা নারী—বিরাজ বৌ, অন্নদাদিদি, শুভদা, সুরবালা প্রভৃতি ; (৪) বিদ্রোহিনী নারী—অভয়া, সুনন্দা, কিরণময়ী, কমল, সুমিত্রা প্রভৃতি ; (৫) সমাজশাসনে নিপীড়িতা নারী—সরযূ, রমা, কুসুম, জ্ঞানদা প্রভৃতি। এমনি আরও দু-একটি টাইপ চেষ্টা করলে খুঁজে বার করা যেতে পারে, তবে বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্প থেকে যে টাইপগুলি চয়ন করে দেখানো হয়েছে সেগুলিই সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক বলে মনে হয়। কোন টাইপের মধ্যেই পড়ে না, প্রত্যেকটি একক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, এমনি দু-চারটি নারীচরিত্রও আছে। যেমন অচলা, বিজয়া, ষোড়শী, বন্দনা প্রভৃতি। উল্লিখিত নাম তালিকা থেকে নীচে কয়েকটি নারীচরিত্রকে বেছে নিয়ে তাদের আলোচনা করছি। অন্যান্য অধ্যায়ে নারীচরিত্র সম্বন্ধে যে-আলোচনা আছে এই আলোচনাকে তার পরিপূরক মনে করতে হবে।

ভারতীয় নারীর সহনশীলতা ও ক্ষমাপ্রবণতার রূপটি সবচেয়ে বেশী ফুটেছে শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের অন্নদাদিদি ও শুভদা উপন্যাসের নাম-চরিত্রের মধ্যে। জন্মজন্মান্তরের ধারাবাহী পাতিব্রত্যের সংস্কারে বদ্ধ ভারতীয় নারীর সহিষ্ণুতা যে একমাত্র সর্বংসহা ধরিত্রীর সঙ্গেই তুলনীয়, এই দুটি চরিত্রের সংস্পর্শে এলে সে কথা বোঝা যায়। অন্নদাদিদি তার স্বামীকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল। কিন্তু তার স্বামী ছিল এক পয়লা নম্বরের লম্পট। সে তার বিধবা শ্যালিকার প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে হত্যা করে পালিয়েছিল। হত্যাকারীরূপে আত্মগোপনরত অবস্থায় সে পুলিশের চোখে ধুলো দেবার

জন্য মুসলমান ধর্ম ও নাম ভাঁড়িয়ে সাপুড়ের বৃত্তি গ্রহণ করে। এত সব অবস্থান্তরের মধ্যেও কিন্তু অন্নদাদিদি তার স্বামীকে ত্যাগ করেনি। স্বামী মুসলমান হয়েছে সুতরাং সেও মুসলমান হলো। স্বামীর ধর্মই তার ধর্ম। শাহজী এক এক দিন বেঘোর মত্ত অবস্থায় অন্নদাদিদিকে প্রচণ্ড মারধোর করে, অন্নদাদিদি নীরবে সব সহ্য করে। তার উপরে আছে নিত্য অভাবের তাড়না। অতি কষ্টে সংসার চলে। সেই কষ্ট আরও বহুগুণিত হয় স্বামীর কদর্য ব্যবহার ও গালিগালাজের অশ্রান্ততার দ্বারা। কিন্তু এততেও অন্নদাদিদির ধর্ম কিংবা পতিপ্রেম বিচলিত হয় না। স্বামিত্বের আদর্শের যূপমূলে উৎসর্গীকৃতা এই নারীর দুঃখসহনের শক্তি সত্যই অতুলনীয়। মনে হয় অন্নদাদিদির ভিতর পতিপ্রেম অপেক্ষা পতিপ্রেমের সংস্কারটাই বেশী কাজ করেছে। ভারতীয় সমাজে নারীর এমনতর সংস্কার দ্বারা চালিত হওয়ার দৃষ্টান্ত অল্প নয়। সতীধর্মপালনে ভারতীয় নারীর আত্মোৎসর্গ কোন্ সীমা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে অন্নদাদিদি তারই উদাহরণ। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এই উদাহরণকে সতীত্বের তপস্যার কোঠায় ফেলেছেন। তিনি অন্নদাদিদিকে এক মহা-তপস্বিনীরূপে দেখেছেন। (শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র, পৃ. ৬৩)। এই বিচার ও দর্শন যথার্থ বলে মনে হয়।

শুভদাও প্রায় অনুরূপ ছাঁচে গড়া এক অসাধারণ সহিষ্ণু চরিত্র। তার স্বামী হারাণ গেঁজেল গুলীখোর জুয়াড়ী। একদা জমিদারী সেরেস্তাতে কাজ করতো, তহবিল তছরূপের দায়ে তার চাকরি যায়। তারপর থেকে চেয়েচিন্তে ধার করে নানারকম ফেরেপবাজি করে সে তার নেশার খোরাক জোটায়। আত্মসম্মানের শেষ অবলম্বনটিও সে খুইয়েছে। সংসার প্রতিপালনে সে তো সাহায্য করেই না, সে ক্ষমতাও তার নেই, উল্টো যখন-তখন টাকার জন্য স্ত্রীর উপর উৎপাত করে। শুভদাকে তার সন্তানদের নিয়ে মাঝে মাঝেই উপোস করে থাকতে হয়। কিন্তু এততেও শুভদার ক্ষমাপ্রবণতা ক্ষুণ্ণ হয় না। অন্য উপায় নেই বলে সে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করে এ কথা বললে শুভদার চরিত্রের যথার্থ পরিমাপ করা হয় না, বলা উচিত ভারতীয় নারীর পাতিব্রত্যের মজ্জাগত সংস্কারটাই তার সহনশীলতার মূল উৎস। গভীর দুঃখ সয়েও এই নারী আপন মহিমা থেকে বিচ্যুত হয়নি।

বিদ্রোহিনী নারীচরিত্রের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বলিষ্ঠ শ্রীকান্ত

দ্বিতীয় পর্বের অভয়া চরিত্রটি। তার নির্ভীকতার কোন তুলনা হয় না। প্রতিবেশী যুবা রোহিণীকে সহায়স্বরূপ সঙ্গে নিয়ে সে এসেছিল বহুদিন নিরুদ্দেশ স্বামীর খোঁজে বর্মা মুলুকে। এসে দেখে তার স্বামী এক বর্মিনীকে বিয়ে করে একগণ্ডা ছেলেপিলে নিয়ে ওই দেশেই স্থিতি করেছে। কদর্য তার জীবনযাত্রা, রুচি অতি কুৎসিত। অভয়া স্বামী নামক আদর্শের আলেয়ার পশ্চাতে আর বৃথা ধাওয়া না করে রোহিণীর ভালবাসাকে মর্যাদা দিয়ে তার সঙ্গেই স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করতে লাগলো। যে-যুক্তিতে অভয়া তার এই কাজের সমর্থন করলো তা তার নিজের মুখেই শোনা যাক :

"আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না, আর এসেও উপায় হলো না। এখন তাঁর স্ত্রী. তাঁর ছেলেপুলে, তাঁর ভালবাসা কিছুই আমার নিজের নয়। তবুও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে ফলে ভরে উঠে সার্থক হতো শ্রীকান্তবাবু? আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারা জীবন বয়ে বেড়ানোই কি আমার নারীজন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা? রোহিণীবাবুকে তো আপনি দেখে গেছেন। তাঁর ভালবাসা তো আপনার অগোচর নেই; এমন লোকের সমস্ত জীবনটাকেই পঙ্গু করে দিয়ে আমি আর সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্তবাবু।...একটা রাত্রির বিবাহ অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছে স্বপ্নের মত মিথ্যা হয়ে গেছে, তাকে জোর করে সারা জীবন সত্য বলে খাড়া করে রাখবার জন্য এই এতবড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ করে দেব? যে বিধাতা ভালবাসা দিয়েছেন তিনি কি তাতেই খুসি হবেন?"

প্রশ্ন উঠতে পারে রোহিণীর ঔরসে অভয়ার গর্ভে যে সন্তান জন্মলাভ করবে তাদের সামাজিক স্থান কোথায় হবে? এরও উত্তর অভয়ার কথায় পাওয়া যায়। সে পূর্ববর্তী বক্তব্যের জের টেনে শ্রীকান্তকে বলছে: "আমাকে আপনি যা ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবী সন্তানদের আপনারা যা খুসি বলে ডাকবেন, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি শ্রীকান্তবাবু, আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না—এ আমি আপনাকে নিশ্চয় বলে রাখলুম। আমার গর্ভে জন্মলাভ করাটা তারা দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না। তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিস তাদের বাপ-মায়ের হয়ত কিছুই থাকবে না; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু

দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেছে, সত্যের মত বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই।"

এই দুটি উক্তি থেকেই বোঝা যায় চরিত্রটি কত সত্যের তেজে পূর্ণ। এই তেজই তাকে বিদ্রোহের পথে পা বাড়াবার বল জুগিয়েছে।

চরিত্রহীন উপন্যাসের কিরণময়ী বিদ্রোহিনী সন্দেহ নেই কিন্তু সে তার বিদ্রোহের শেষ রক্ষা করতে পারেনি। বাইরে সে নিরীশ্বরবাদিনী, ভারতীয় শাস্ত্রবাক্যগুলিকে সে মোটেই মূল্য দেয় না। আচরণও তার নিষ্কলুষ নয় স্বামী বেঁচে থাকতেই সে অনঙ্গ ডাক্তারকে তার রূপমোহে ভোলাতে চেষ্টা করে, পরে দিবাকরকে ভাগিয়ে রেঙ্গুনে নিয়ে যায়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার অন্য একটি সত্তা আছে। সেখানে সে প্রেমতৃষিত ; পাতিব্রত্যের মাধুর্যের দ্বারা নিজেকে মণ্ডিত করে তুলতে একান্ত উৎসুক। বাহির ও ভিতরের এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রবণতার মধ্যে সংঘাতের ফলে যে tension-এর সৃষ্টি হয়েছে তা তাকে শেষ পর্যন্ত বেচাল করে দিল, তাকে পাগল বানিয়ে ছাড়ল। কিরণময়ীর বিদ্রোহ সার্থক হতে পারলো না।

শেষ প্রশ্নের কমল কথার ঝুড়ি বিশেষ। তার আচরণে যত না, তার কথার মধ্যে তার চেয়ে অনেক বেশী বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। কমলের কথাগুলি এক একটি বিদ্রোহের গোলা। শব্দের বিস্ফোরক শক্তি যদি কথার কথা না হয়, তার অগ্ন্যুদ্গিরণ ক্ষমতা যদি স্বীকার্য হয়, তা হলে বলতেই হবে যে, কমল একটি বিদ্রোহিনী চরিত্র। তবে এমন যে বিদ্রোহিনী নারী, সেও রাজেনের কাছে একবারে চুপসে গেছে। রাজেনের অসাধারণ সাহস, সেবাদর্শ, বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ, যে কোন সময় মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার দ্বিধাহীনতা ও শেষ পর্যন্ত বিপন্নকে রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ সচরাচর বাক্যের সরণিতে চলায় অভ্যস্তা কমলকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে।

শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বে সুনন্দার বিদ্রোহের প্রকৃতি কিছু ভিন্ন। তার বিদ্রোহ নারীত্ব সম্পর্কিত নয়। সে একটি সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। পুরুষের অন্যায় মুখ বুঁজে সহ্য করাটাই মেয়েদের অভ্যাস— এই গতানুগতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে সুনন্দা বাংলার গ্রামীণ নারী সমাজে একটি মহদ্দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ বিষয়ে উপক্রমণিকার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

অন্তর্দ্বন্দ্বের সংঘাতে পীড়িত নারীহৃদয়ের প্রতীক হিসাবে অচলার

চরিত্রটির কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। এটি একটি জটিল চরিত্র—বোধ হয় শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে জটিল। রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে উপন্যাসের বিমলা চরিত্রের সঙ্গে অচলার বাহ্যিক মিল অনেকখানি, কিন্তু তাদের দুজনার অন্তরপ্রকৃতিতে বেমিল রয়েছে। বিমলা নিজে বৈভবের মধ্যে বর্ধিতা, তার স্বামী নিখিলেশ জমিদার, সুতরাং ঐশ্বর্যের মোহ তার নেই, কিন্তু অচলা চরিত্রে এই ঐশ্বর্যের মোহ অনেকখানি কাজ করেছে। সুরেশের বৈভব, অর্থব্যয়ক্ষমতা আকণ্ঠঋণভারগ্রস্ত দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট পিতার কন্যা অচলার চোখে দরিদ্র স্বামী মহিমের দাম কমিয়ে দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার উপর মহিমের গাম্ভীর্য, স্বভাবগত বাক্‌কুণ্ঠা ও নিজেকে আবৃত রাখার অর্থাৎ নিজের দাবিকে জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে না চাওয়ার অভ্যাসের পাশে সুরেশের অলজ্জ আত্মঘোষণা ও আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা অচলার চিত্তকে আরও বেশী দ্বিধান্বিত করে তুলেছিল। অচলা বুঝতেই পারেনি সে মহিমকে ভালবাসে কি সুরেশকে ভালবাসে। আর যদি দুইয়েরই প্রতি এককালীন প্রেম তার চিত্তে ঘনিয়ে থাকে তো কার প্রতি তার পক্ষপাত সমধিক তা সে নিরূপণ করে উঠতে পারেনি। আপনাকে না চিনতে পারার এই মুহ্যমানতাই তার জীবনে ট্রাজিডি ঘনিয়ে তুলেছিল। তবে অচলার সপক্ষে এই এক বলবার কথা যে, সুরেশের কাছে আত্মদানের মুহূর্তেও ভারতীয় নারীর যুগযুগসঞ্চিত স্বামিত্বের সংস্কার তাকে ত্যাগ করেনি। সে অন্তরের অন্তরে পাতিব্রত্যের আদর্শকে লালন করেছে। আর এইটেই বুঝি শেষ পর্যন্ত তার উদ্ধারের কারণ হয়েছে। অন্ততঃ গৃহদাহের উপসংহার থেকে সেইরূপই মনে হয়।

॥ ৯ ॥

চাষীচরিত্র

সুপ্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাবলীতে বাংলার কৃষক সমস্যার প্রত্যক্ষ চিত্রায়ণ খুব বেশী পাওয়া না গেলেও এটা মনে করা চলে যে, তিনি গ্রামের যে-স্তরের মানুষের ছবি সচরাচর তাঁর গল্পে-উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন—মধ্য ও নিম্নবিত্ত হিন্দুসমাজভুক্ত সাধারণ নরনারীর জীবন—তাদের রসদের উপকরণ কোথা থেকে আসে সে বিষয়ে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। রোদ জল ঝড় উপেক্ষা করে ক্ষেতে ও খামারে চাষীর উদয়াস্ত খাটুনিটাই যে গ্রামের মধ্যবিত্ত মানুষের টিকে থাকার মূল অবলম্বন এই বোধ তাঁর মনে বিলক্ষণ মাত্রায় উপস্থিত না থাকলে তিনি মহেশের মত অনবদ্য গল্প লিখতেই পারতেন না। অন্যান্য কাহিনীর মধ্যেও ইতস্ততঃ খণ্ড-বিচ্ছিন্নভাবে চাষীজীবনের যে সমস্ত টুকরো-টুকরো ছবি পাওয়া যায় তাতেও প্রমাণ হয়, বাংলার কৃষকের সনাতন দুঃখ-দারিদ্র্যের বাস্তব ভিত্তি এবং অর্থনৈতিক পশ্চাৎপট দুইয়ের বিষয়ে তিনি সম্যক্ অবহিত ছিলেন। তাঁর মত সমাজচৈতন্য-প্রদীপ্ত লেখক বাংলার গ্রামীণ জীবনের সর্বপ্রধান সমস্যাটির বিষয়ে অজ্ঞান থেকে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু ভদ্রলোকশ্রেণীর গ্রামবাসীদের জীবনাবলম্বনে লেখনী চালনা করেছেন এ হতেই পারে না। এরূপ ভাবতে গেলে শরৎচন্দ্রের অপরিসীম মানবদরদপূর্ণ শিল্পিস্বভাবকেই অস্বীকার করতে হয়।

তবে যে শরৎচন্দ্র তাঁর গল্পোপন্যাসে চাষীজীবনের ব্যথা-বেদনাকে তেমন ব্যাপকভাবে রূপায়িত করেননি—রূপায়িত করবার জন্য সচেষ্ট হননি—তার অন্য কারণ আছে। সব শিল্পীকেই নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও ঝোঁক অনুযায়ী স্বীয় বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হয়। এই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও গভীরতাটাই তাঁর নির্বাচনের দিক নির্দেশ করে। শরৎচন্দ্র চাষীজীবনের সমস্যাদির সঙ্গে পরিচিত থাকলেও, তিনি নিজে গ্রামসমাজের যে শ্রেণী থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার ছক, ভাবনা-চিন্তার ছাঁচ, অভাব-অভিযোগের স্বরূপ, দুঃখ-বেদনার প্রকৃতি ইত্যাদির সঙ্গে

প্রত্যক্ষ মেলামেশার সূত্রে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত ছিলেন বলে, সেই মানুষদের জীবনবৃত্তটাই তাঁর লেখায় বারে বারে মুখ্য মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনি চাষীদের নিয়েও লিখতে পারতেন কিন্তু সে লেখা এমন প্রকৃষ্টরূপে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারতো না, যেমনটা হয়ে উঠেছে তাঁর পল্লীসমাজ, নিষ্কৃতি, বিরাজ বৌ, বৈকুণ্ঠের উইল, মেজদিদি, চন্দ্রনাথ, দেবদাস, কাশীনাথ, অরক্ষণীয়া, শ্রীকান্ত (তৃতীয় পর্ব), বিন্দুর ছেলে ও রামের সুমতি প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পের একান্ত হিন্দুসমাজভিত্তিক সাধারণবিত্ত ও নির্বিত্ত ভদ্রলোকশ্রেণীর গ্রামীণ নরনারীর জীবনচিত্রের রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। যে-সম্প্রদায়ের লোকেদের সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে জানাচেনা ছিল, সেই সম্প্রদায়ের কথা লিপিবদ্ধ করে তিনি তাঁর শিল্পিস্বভাবকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন, এর দ্বারা চাষীজীবনের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য বা উপেক্ষা বোঝায় না।

চেষ্টা করলে তিনি গফুর জোলার মত চরিত্র আরও দু-একটি সৃষ্টি করতে পারতেন, তবে সেটা তাঁর পক্ষে সহজাভ্যস্ত ব্যাপার হতো না, তাঁর স্বাভাবিক চলাচলের ও অভিজ্ঞতার গণ্ডীর বাইরে গিয়েই তাঁকে এ কাজ করতে হতো। চাষীজীবনের প্রতি মমত্ব থাকা এক কথা আর চাষীজীবনকে তার ভালয়মন্দয় মিশিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিবিড়ভাবে চিত্রিত করা আর এক কথা; এই দুটি এক জিনিস নয়। শরৎচন্দ্র বিবেকবান লেখক ছিলেন, তাই তিনি তাঁর শিল্পিস্বভাবের সীমা অবিরোধে মেনে নিয়েছিলেন। চাষীজীবনকে তার স্ব-স্বরূপে এবং সমস্ত দিক পরিবেষ্টন করে চিত্রিত করতে পারেন একমাত্র সেই লেখক, যিনি স্বয়ং চাষীরই মত 'মাটির কাছাকাছি' স্তর থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। শরৎচন্দ্র মাটির কাছাকাছি স্তরোদ্ভূত লেখক ছিলেন না, তিনি ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সীমাবদ্ধতার মধ্যে জাত সামাজিক বিশ্বাসে কিয়ৎপরিমাণে রক্ষণশীল অথচ মানবপ্রীতিতে ভরপূর একজন দরদী কথাকার। তিনি তাঁর গল্পে-উপন্যাসে বাংলার চাষীর সামগ্রিক চিত্র উত্থাপনের চেষ্টা করেননি এ তাঁর অপ্রমাদ ক্ষেত্রাক্ষেত্রনির্বাচনী প্রতিভারই পরিচয় দেয়।

অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন শরৎচন্দ্রকে 'ডক্টর অব্ লিটারেচার' উপাধিতে ভূষিত করা হয় তখন তিনি সখেদে জানিয়েছিলেন যে, বাংলার মুসলমান সমাজকে তিনি তাঁর গল্পে-উপন্যাসে তেমন করে ফুটিয়ে তুলতে

পারেননি ; এখন থেকে তাঁর একটা সজ্ঞান চেষ্টা হবে এই সমাজের মানুষের সুখদুঃখ ব্যথাবেদনাকে তাঁর রচনার একটি অন্যতম প্রধান উপজীব্যরূপে গ্রহণ করা। অবশ্য এই ঘোষণার পর শরৎচন্দ্র আর বেশীকাল জীবিত ছিলেন না, ফলে ওই সাধু সংকল্পকে কার্যে পরিণত করে যাওয়ার অবসর আর তেমন হয়নি তাঁর জীবনে। বাংলার মুসলমান সমাজ বলতে শরৎচন্দ্র বাংলার চাষী সমাজকেই বুঝিয়েছেন কেন না বাংলার মুসলমান সমাজের শতকরা প্রায় নব্বুই ভাগ মানুষই গ্রামবাসী আর তাদের জীবিকার প্রধান উপায় অথবা অনুপায় কৃষিকর্ম। এদের মধ্যে জমিহীন চাষীর সংখ্যাই বেশী, পরের জমিতে তাদেরই দেওয়া হাল বলদ বীজ ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে লাঙল চষার দিনমজুরি বৃত্তি বেশীরভাগ এই জাতীয় মানুষের মূলাশ্রয়। যখন চাষবাসের কাজ থাকে না তখন হয় উপোস করে থাকতে হয়, না হয় তো সম্পন্ন চাষী গৃহস্থের ঘরে 'মুনিষ' খেটে, ঘরামি কিংবা কাঠ চেরা-ফাঁড়া কিংবা মাটি কাটা জাতীয় নানা কঠিনশ্রমসাধ্য কাজ করে দিন গুজরানের চেষ্টা করতে হয়। তাও কাজ জোটাতে পারা না-পারার উপর রোজগারের সম্ভাবনা নির্ভর করে। অধিকাংশ ভূমিহীন চাষীরই ভিটেমাটি দেনার দায়ে মহাজনের ঘরে বাঁধা। ভিটা থেকে উচ্ছন্ন হওয়ার ঘটনা এত বেশী যে ব্যতিক্রমদৃষ্টান্ত না থেকে সেইটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র এই শ্রেণীর মানুষের চিত্রচরিত্রের উপর তাঁর শৈল্পিক মনোনয়ন ন্যস্ত করার বিস্তৃত সুযোগ কিংবা উপলক্ষ খুঁজে পাননি তাঁর লেখকজীবনে। দৈবাৎ দু-একটি গফুর (মহেশ) কিংবা আকবর লাঠিয়াল (পল্লীসমাজ) কিংবা সাগর সর্দার (দেনা-পাওনা) তাঁর লেখায় আকস্মিকভাবে উঁকিঝুঁকি দিয়ে উঠেছে কিন্তু এই শ্রেণীর মানুষ তাঁর সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিতে পারেনি। কিংবা অপেক্ষাকৃত উচ্চ সামাজিক পর্যায়ের মুসলমান চরিত্র ফকির সাহেব (দেনা-পাওনা) অথবা গহর (শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব) সাময়িক আর বিচ্ছিন্ন ভাবেই তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, ওই শ্রেণীর মানুষের উপর তিনি তাঁর অখণ্ড মনোযোগ অর্পণ করার চেষ্টা করেননি। সে-মনোযোগ তিনি অর্পণ করেছেন তাঁর স্ব-সমাজের নরনারীর জীবনবেদনার উপর—ভালত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পশ্চাৎপদতা সমেত। অবশ্য যখন তিনি মুসলমান চাষী চরিত্র এঁকেছেন, প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢেলেই এঁকেছেন কিন্তু অভ্যস্ত

বিষয়বস্তু থেকে তাঁর কল্পনার এই পার্শ্ব-পরিবর্তন কচিৎ ঘটেছে। এই নিয়ে আমরা আক্ষেপ করতে পারি কিন্তু অবস্থার বদল ঘটাতে পারি না। বরং এই ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের তুলনায় পরবর্তীকালের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকগণ সমধিক সময়চেতনার পরিচয় দিয়েছেন বলে মনে হয়। মুসলমান লেখকদের কথা অবশ্য আলাদা। তাঁদের গল্প-উপন্যাসের বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে স্বভাবতঃই মুসলমান চরিত্রের আধিক্য লক্ষ্য করা যায় কিন্তু হিন্দু লেখকদের পক্ষে তাঁদের শ্রেণী-পক্ষপাত আর মজ্জাগত মধ্যবিত্ত মানসিকতার নিগড় ভেঙে বেরিয়ে আসা সহজ ব্যাপার নয়। তবু এরই মধ্যে শরৎচন্দ্র যতটা সম্ভব তাঁর সহানুভূতিকে স্বীয় গণ্ডীর বাইরে সম্প্রসারিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে এই খাতে যতটা পাওয়া গেছে ততটাই লাভ বলে গণ্য করতে হবে।

মুসলমান চাষীজীবনের সমস্যাদির সঙ্গে অভিজ্ঞতালব্ধ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের মুসলমান চিত্র-চরিত্র এড়িয়ে যাবার পক্ষে আরও একটি কারণ থাকা অসম্ভব নয়। পূর্বেই বলেছি শরৎচন্দ্রের শিল্পী হৃদয়ের ভিতর অপরিমিত মানবপ্রীতির সঞ্চয় ছিল, কিন্তু সামাজিক ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বোধহয় ততটা উদার ছিল না। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার চালিত এক ধরনের রক্ষণশীলতা তাঁর চিত্তকে কমবেশী অধিকার ক'রে ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। কুলীন ব্রাহ্মণের মজ্জাগত চিত্তসংকীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠা তাঁর মত স্বভাবদরদী শিল্পীর পক্ষেও সম্ভব হয়নি। তিনি তাঁর সামাজিক মতামতের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিমাণে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্মবিদ্বেষ সুবিদিত। দত্তা, গৃহদাহ প্রভৃতি উপন্যাসে এ কথার অসংশয় প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। হিন্দু সমাজের একাংশ সম্পর্কেই যেখানে চিত্তের এমনতর অনুদারতা, সেখানে স্বভাবতঃ সংস্কারাচ্ছন্ন রাঢ় দেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ভুক্ত একজন লেখক হয়ে তিনি নিজ ধর্মসম্প্রদায়ের গণ্ডী অতিক্রম করে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি চিত্তসংকীর্ণতা পরিহারে সক্ষম হবেন এমনতর মনে করলে মনুষ্যস্বভাবের প্রচলিত গঠনের বিরুদ্ধ-অনুমান করা হয়। আসলে, শরৎচন্দ্র সামাজিক বিশ্বাসে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতই, কিয়ৎ-পরিমাণে মুসলমানবিমুখ ছিলেন। তাঁর এই সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার মনোভাব তাঁর রচনাবলীর আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে উদ্ধার করা যায়—একে উদাহরণ ও উদ্ধৃতি প্রয়োগে চিহ্নিত করা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। শরৎচন্দ্র

ঢাকায় গিয়ে সম্মান ও আতিথেয়তার মুগ্ধতার বশে ভাবোচ্ছ্বাসের মুখে তাঁর সাহিত্যে মুসলমান চিত্রচরিত্র রূপায়ণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে একটা কুলুপ-আঁটা সদিচ্ছার আগল খুলে দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সাময়িক আবেগের প্রকাশের অতিরিক্ত সংকল্পের গভীরতা তাতে ছিল কিনা বলা মুশকিল। তা যদি থাকত তো মুসলমান চাষীজীবন নিয়ে একখানা অন্ততঃ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস তার পরে তিনি লিখে যেতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পাঠকদের এ ব্যাপারে বঞ্চিতই থেকে যেতে হয়েছে শেষাবধি।

তবে কি তাঁর মানবপ্রীতি, দরদ, সহানুভূতি এ সবে কোন খাদ ছিল? মোটেই নয়। শরৎচন্দ্রের মত এতবড় স্বভাবদরদী আবেগসমৃদ্ধ লেখক বাংলা কথাসাহিত্যে খুব বেশী আবির্ভূত হয়নি। তা যদি হয় তো তাঁর এই সহজাত মানবিকতার সঙ্গে তাঁর এই সাম্প্রদায়িক অনৌদার্যকে মেলানো যায় কী করে? যিনি ব্যক্তিস্তরে কোন একটি মানুষের দুঃখে বিগলিতহৃদয়, সমবেদনায় আত্মহারা, তিনিই আবার সেই মানুষটিকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত কল্পনা করে অনুদারতায় কঠিন হয়ে ওঠেন কেমন ভাবে? কিন্তু আচরণের এই স্বতোবিরোধে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—মনুষ্য স্বভাবের ধরনটাই এই রকমের। যে শরৎচন্দ্র সহজাতভাবে মানবদরদী ছিলেন এবং জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর ভবঘুরেপনার মধ্য দিয়ে যিনি সেই স্বাভাবিক মানবকরুণাকে আরও বেশী প্রগাঢ় করে তুলতে পেরেছিলেন, তিনিই আবাব হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দ্বারা চালিত হয়ে নিজেকে নিজে খণ্ডন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। মানুষের মনস্তত্ত্ব এমনিধারা জটিলতার আলো-আঁধারির মধ্য দিয়েই সচরাচর পথ করে চলবার চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত স্তরে গফুর আর তার মেয়ে আমিনার দুঃখে শরৎচন্দ্রের আর্তির সীমা-পরিসীমা ছিল না কিন্তু ওই দুই প্রাণীকেই একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি জ্ঞান করে তাদের সম্পর্কে সুব্যবস্থা করতে বললে শিল্পী শরৎচন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত সামাজিক শরৎচন্দ্রের করুণা কতখানি উচ্ছলিত হয়ে উঠত বলা কঠিন। ভাগ্যিস শিল্পীরা মানুষকে পিণ্ডাকারে বিচার করেন না, বিচার করেন এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত সত্তা হিসাবে, তাই রক্ষা; নয় তো কী বিপর্যয়ই না ঘটতে পারতো! অন্ততঃ শরৎচন্দ্রের বেলায় এ বিপর্যয় ঘটার যে সম্ভাবনা ছিল তা তাঁর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর আদল থেকে একপ্রকার বিনা দ্বিধাতেই বলা যায়। হৃদ্‌গত ভালবাসা আর বুদ্ধিগত চিত্তসংকীর্ণতার দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ওঠা

কিংবা ক্ষুরধার শিল্পচেতনা আর সাম্প্রদায়িক কুসংস্কারের বিরোধ মেটানো অনেক সময় প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পক্ষেও সম্ভব হয় না। আমাদের সাহিত্যে শরৎচন্দ্র এ কথার এক নিদর্শন হলেও একমাত্র নিদর্শন নন। এ ব্যাপারে তিনি 'সুমহান সঙ্গে' রয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরী।

২

শরৎসাহিত্যে বঞ্চিত চাষীজীবনের দুঃখের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত মহেশ গল্পটি। শিল্পকর্ম হিসাবে তো বটেই, নিপীড়িত শোষিত সর্বরিক্ত মানুষের দুঃখের চিত্রায়ণ হিসাবেও এ গল্পের উৎকর্ষের কোন তুলনা হয় না। শুধু তাই নয়, এ গল্পে সর্বহারা মানুষের বেদনার পাশে পাশে অবোলা একটি পশুর আর্তনাদ অনুভূতিকেও শ্রেষ্ঠ শিল্পসৌন্দর্যে মণ্ডিত করে প্রকাশ করা হয়েছে। এই গল্পে একদিকে ফুটে উঠেছে জমিদারের নৃশংসতা, হিন্দু সমাজপতি শ্রেণীর এক প্রভুত্বগর্বী ব্রাহ্মণের ক্রূরতা : অন্যদিকে ফুটে উঠেছে বঞ্চিত পীড়িত এক দরিদ্র মুসলমান চাষীর নিষ্করুণ অভাব-অনটন ও মর্মান্তিক অসহায়তা, দারিদ্র্যের ধু-ধু করা মরুভূমির তলায় ফল্গুধারার মত নিম্নতবহমান স্নেহবাৎসল্যের অদৃশ্য স্রোত, নিম্নতর এক প্রাণীর ক্ষুৎপিপাসার কাতর কারুণ্য, সর্বোপরি শূন্যতার অভিশাপ। গল্পের সামাজিক তাৎপর্য খুব গভীর। কেমন করে, কোন্ প্রক্রিয়ায়, ক্ষেতের চাষী চাষের জমি থেকে উৎখাত হয়ে কলে-কারখানায় শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে তারই একটি নিপুণ ইঙ্গিত এই গল্পের উপসংহারভাগে করা হয়েছে। গল্পের এই অর্থবহ সমাজতাত্ত্বিক সংকেত অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের উপরে রচনাটির একটি অতিরিক্ত সম্পদ। এই গল্পের বক্তব্য অনুযায়ী শিল্প-কারখানার শ্রমিকজীবন ছিন্নমূল কৃষিজীবনেরই গত্যন্তরহীন রূপান্তরণ মাত্র। বক্তব্যটি খাঁটি।

পল্লীসমাজ উপন্যাসের নায়ক রমেশ অনেক দিন বাদে গ্রামে ফিরে এসে স্বগ্রামের উন্নতি সাধন চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিল কিন্তু গ্রামের প্রতিপত্তি-শালী কুচক্রী হিন্দু সমাজপতিদের বাধাদানের ফলে প্রতিহত হয়ে পাশের মুসলমানপ্রধান গ্রাম পীরপুরের চাষীদের মধ্যে উন্নয়নের কাজ শুরু করে দেয়। রমেশ চাষীর ছেলেদের জন্য নিজ ব্যয়ে আলাদা স্কুল করে দেয় এবং রোজ সন্ধ্যায় পীরপুরে সমাগত হয়ে চাষীদের নিয়ে বৈঠক করে তাদের

মধ্যে জাগরণের বাণী শোনাতে থাকে। চাষীরা রমেশকে দেবতার মত ভক্তি করে এবং তার জন্য জান দিতে প্রস্তুত। পার্শ্ববর্তী গ্রামের হিন্দু জমিদার শ্রেণীর একজন যুবকের সঙ্গে গরিব ও মুসলমান চাষীদের যে সম্পর্কের চিত্র আঁকা হয়েছে তার মধ্যে আদর্শবাদী পরোপকারেচ্ছার একটা সুন্দর আলেখ্য পাওয়া গেলেও বর্তমান অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার মানদণ্ডে একে ভাববাদী আবেগপ্রসূত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ফিলানথ্রপির মনোভাব ছাড়া আর কোন নাম দেওয়া যায় না—এর মধ্যে শ্রেণীস্বরূপ ঘোচাবার চেষ্টার কোন কথাই নেই। সুতরাং রমেশের এই জাতীয় কৃষক-উপচিকীর্ষা গোড়া থেকেই সন্দেহস্থল, তদুপরি অকার্যকরও বটে। অবাস্তব কর্মসূচী থেকে বাস্তব ফল আশা করা যায় না, এই ক্ষেত্রেও রমেশের কৃষক শ্রেণীর ভাগ্যোন্নয়ন চেষ্টা তাদৃশ ফলপ্রসূ হয়নি, বলা অনাবশ্যক।

তবে পল্লীসমাজ উপন্যাসের দু-একটি চিত্র তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন বাঁধের মুখ খুলে দেওয়ার ব্যাপারে বেণী ঘোষালের সঙ্গে রমেশের বিরোধের ঘটনাটি। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে চাষীদের একশ' বিঘে পরিমাণ মাঠ ডুবে যাওয়ায় সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। তাদের গোটা বছর উপোস থাকার উপক্রম। মাঠের দক্ষিণ ধারে ঘোষাল ও মুখুজ্যেদের একটা বাঁধ, সেই বাঁধ দিয়ে জলনিকেশ করা হলে মাঠের ধান রক্ষা পায় কিন্তু বাঁধের গায়ে একটা জলা আছে—বছরে দুশো টাকার মাছ ওতে পাওয়া যায়। বেণীবাবু বাঁধের মুখ আটকে রেখেছেন। রমেশ চাষীদের হয়ে বেণীবাবুর কাছে দরবার করতে এলো কিন্তু বেণী রমেশের শত অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও বাঁধের মুখ খুলতে রাজী হলেন না। বললেন, চাষীদের ধানের দাম পাঁচ হাজারই হোক আর পঞ্চাশ হাজারই হোক, তিনি "ও শালাদের জন্যে" তাঁর হকের দুশো টাকা মাছের দাম কোনমতেই ছেড়ে দিতে পারেন না। রমেশ শেষ চেষ্টা করে বলল, "তবে চাষীরা খাবে কি?" বেণী মুখ ভেংচে জবাব দিলেন, "খাবে কি? দেখ'ব ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে।···ওরা খাবে কি? ধার-কর্জ করে খাবে। নইলে আর ব্যাটাদের ছোট লোক বলেচে কেন?"

এই বিরোধের পরিণতিতে ঘটলো দাঙ্গা-হাঙ্গামা। রমেশ জোর করে বাঁধের মুখ খুলে দিতে গেল, তাকে আটকাবার চেষ্টা করতে গিয়ে বেণী ও

রমার প্রেরিত লাঠিয়ালের দল—আকবর আলি ও তার দুই ছেলে—বেদম মার খেলো। বেণীবাবু আকবরকে উত্তেজিত করতে লাগলেন থানায় গিয়ে শরীরের আঘাত দেখিয়ে রমেশের বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করতে। কিন্তু আকবরকে এ প্রস্তাবে রাজী করানো গেল না। তার দৃপ্ত উত্তর: "কি কও বড়বাবু, সরম নেই মোর? পাঁচখানা গাঁয়ের লোক মোরে সর্দার কয় না? দিদি ঠাকরাণ (রমাকে উদ্দেশ করে), তুমি হুকুম করলে আসামী হয়ে জ্যাল খাটতে পারি, ফেরিদি হব কোন্ কালামুখে?... না দিদিঠাক্‌রাণ, আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোট দেখাতে পারি না। ওঠ্‌রে গহর (ছেলেকে উদ্দেশ করে), এইবার ঘরকে যাই। মোরা নালিশ করতি পারব না।"

এই গ্রামচিত্রের মধ্য দিয়ে মুসলমান চাষী আর হিন্দু ভদ্রলোক জোতদার শ্রেণীর মানুষদের মনোভাবের যে-পার্থক্য দেখানো হয়েছে তা খুবই অর্থপূর্ণ। শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী কথাকার হিসাবে এখানে বাস্তববাদকে পূর্ণ সম্মান দিয়েছেন।

দেনা-পাওনা উপন্যাসে হরিহর সর্দার ও সাগর সর্দার নামক খুড়ো-ভাইপো দুই লাঠিয়ালের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। সাগর সর্দারের চরিত্রটাই বেশী বিস্তার করে দেখানো হয়েছে। এরা চণ্ডীগড়ের ভূমিজ চাষী সম্প্রদায়ের লোক, এককালে এই সম্প্রদায়ের সকলেই গৃহস্থ কৃষক ছিল, কিন্তু এখন অধিকাংশই ভূমিহীন—পরের ক্ষেতে মজুরি করে বহু দুঃখে দিনপাত করে। সমস্ত জমিজমা হয় জমিদার নয় জমিদারের কর্মচারীর দল স্বনামে বেনামে গিলে খেয়েছে। জোতদারের অত্যাচারও তাদের বঞ্চিত হওয়ার একটি বড় কারণ। ফলে ভূমিহীন ভূমিজদের কষ্টের অবধি নেই। এদেরই দুই প্রতিনিধি হরিহর ও সাগর উপায়হীনতার ক্ষোভে মরিয়া হয়ে ডাকাতির পেশা আশ্রয় করেছে, গোটা তল্লাটে মারদাঙ্গা করতে তাদের জুড়ি কেউ নেই। কিন্তু দুজনেই দেনা-পাওনার মূল নারীচরিত্র চণ্ডী মন্দিরের ভৈরবী ষোড়শীর খুবই অনুগত, ভৈরবী মায়ের হুকুমে যে কোন সময় প্রাণ বিপন্ন করতে প্রস্তুত, জমিদারের লোকেদের সঙ্গে কাজিয়া করে একাধিকবার জেল খেটে এসেছে। আবারও মায়ের হুকুমে জেলে যেতে তৈরী। সাগর সর্দারের চরিত্রের রূপরেখাটি খুবই দরদের সঙ্গে উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে।

বাংলার জমিদার, অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত লেখকদের চোখে লাঠিয়ালদের আনুগত্যের ভূমিকাটাকে বারবার অত্যন্ত বড় করে দেখানো হয়েছে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। লাঠিয়াল, সে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্তই হোক আর মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্তই হোক, তার কোন রকমে বেঁচে থাকাটা যেন তার জীবনের চরমতম সার্থকতা। মানুষের মর্মঘাতী দারিদ্র্যের বেদনাকে খাট করে এই শ্রেণীর চিত্রণে বড় করে দেখানো হয়েছে এমন এক মূল্যবোধকে, যা অন্যথা-শ্রদ্ধেয় হলেও কায়েমী স্বার্থকে বাঁচিয়ে রাখতেই বরং সাহায্য করে এবং স্বশ্রেণীর বঞ্চনার দুঃখকে আরও দীর্ঘায়িত করে! এই জাতীয় প্রমাদপূর্ণ আনুগত্যের মাহাত্ম্যকীর্তন শরৎচন্দ্রের আগেও হয়েছে, পরেও হয়েছে—শরৎচন্দ্রই একক উদাহরণ নন। আদৌ মূল্য না দিয়ে কিংবা সামান্যই মূল্য দিয়ে পরের সেবা পেতে অভ্যস্ত আমরা তথাকথিত হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর লাঠিয়ালদের আমাদের কারণে জান মান ইজ্জত, এক কথায় সর্বস্ব খোয়ানোর সদাপ্রস্তুত মনোভাবকে একটা মহাগুণরূপে কীর্তন করতে সর্বদাই ব্যগ্র কিন্তু ভুলেও ভেবে দেখি না আমাদের প্রতি তাদের এই প্রশ্নহীন আনুগত্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের দারিদ্র্যের অভিশাপটাই চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে মাত্র। মনিবের প্রতি ভৃত্যের বিশ্বস্ততা একটা মস্ত বড় গুণ সন্দেহ নেই, কিন্তু ভৃত্যের প্রতি মনিবের কর্তব্য পালনের দিকটাও সমভাবে কীর্তিত হওয়া উচিত। শুধু লাঠিখেলার 'মন্ত্রশক্তি'র মহিমার উদ্‌ঘোষণ দ্বারা সত্যের একটা প্রান্তকেই তুলে ধরা হয় মাত্র, অন্য প্রান্তটি সম্পূর্ণ চোখের আড়ালে থেকে যায়।

আকবর আলি, সাগর সর্দার, ঈশ্বর লাঠিয়াল—শ্রেণীর প্রত্যেকটি চরিত্রই বাংলা সাহিত্যের একটি পরিচিত ছকের চরিত্র, লাঠিয়াল শ্রেণীর এরা 'আর্কেটাইপ' ; কিন্তু ক্রমাগত একই ধারায় উপস্থাপিত হতে হতে ছকটি বড়ই পুরনো আর একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। গ্রামীণ লাঠিয়াল সম্প্রদায় আজ আর তার পূর্ব স্বরূপে নেইও। সুতরাং এমনতর চরিত্র যদি রাখতেই হয়, ছকটির নবীকরণ দরকার। ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে প্রভুর জন্য জান দেওয়ার সংস্কার দেশে পরিবর্তিত রাষ্ট্রিক ও সামাজিক স্থিতিতে একটি শ্লাঘনীয় মূল্যবোধ হিসাবে আর প্রশ্রয় না পাওয়াই ভাল।

॥ ১০ ॥

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও জনচিত্তহারী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মধ্যে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, সম্পর্ক ছিল অগ্রজ ও অনুজের, শ্রদ্ধা ও স্নেহের। কিন্তু মাত্র এইটুকু বললে সম্পর্কটির প্রকৃতির সঠিক নিরূপণ হয় না। আপাত-দৃষ্টিতে যা দেখা যায় তার চেয়ে এই সম্পর্ক জটিলতর ছিল বলে মনে হয়। কেন না দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করে এ কথা মনে না করে পারা যায় না যে, এই সম্পর্কের স্রোতধারায় কখনও জোয়ারের প্রাবল্য এসেছে কখনও ভাঁটার টান লেগেছে, দুই পক্ষেই কখনও অনুরাগ ও প্রীতির উচ্ছলতা প্রকাশ পেয়েছে, কখনও প্রীতির প্রকাশ স্পষ্টতঃই মন্দীভূত হয়েছে। উভয়ের মনোভাবের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে একান্তরক্রমে এই যে আলো-আঁধারির লীলা দেখতে পাওয়া যায়, তার মূলে নানাবিধ সাময়িক ঘটনার উপদ্রব যে কখনও কখনও উত্তেজক কারণরূপে বর্তমান ছিল তা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না। এই দুই অসাধারণ প্রতিভাবান স্রষ্টা লেখককে কেন্দ্র করে বিপরীত মানসিকতাসম্পন্ন যে দুই ভক্তমণ্ডলী বিরাজিত ছিল তাঁদের প্রভাবও জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সম্পর্কটিকে জটিল করে তুলতে সাহায্য করেছে সে কথাও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। তবে কারণ যাই হোক, মহৎ দুটি মানুষের মনস্তত্ত্বের গভীরতার পরিমাপ করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র সম্পর্কের আদলের একটা রূপরেখা মাত্র আমি তুলে ধরবার চেষ্টা করব, কখন কোন্ মনোভাবের বশে তাঁরা একে অন্যের প্রতি কী ব্যবহার করেছেন বা কী বলেছেন তা বিশ্লেষণ করতে যাব না। অর্থাৎ তাঁদের আচরণের প্রতি উদ্দেশ্য আরোপ করা আমার অভিপ্রায় নয়; শুধু দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকব।

সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় কোনও একজন সমালোচক এইরূপ ইঙ্গিত করেছেন যে, শরৎচন্দ্রের প্রতি কবির মনে স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ককে ছাপিয়ে এক ধরনের ঈর্ষাতুর মনোভাব ছিল। এ কথার প্রমাণ স্বরূপে তিনি পথের দাবী উপন্যাস পাঠের পর শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির উল্লেখ

করেছেন ও অন্য আরও কয়েকটি ছোট-বড় নজিরের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু এই অভিযোগ যথার্থ মনে হয় না। এই অভিযোগ স্বীকার করে নিলে রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হয় এবং মানুষ হিসাবে তাঁর অবমূল্যায়ণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব ও উদারতার দৃষ্টান্ত এত ভূরি ভূরি যে, তাঁর চেয়ে কমপক্ষে চোদ্দ বছরের কনিষ্ঠ একজন লেখকের সাহিত্যিক খ্যাতিতে তিনি ঈর্ষান্বিত হবেন, এমন কথা ভাবতে পারা যায় না। আসলে পথের দাবী উপন্যাসটির উপর যখন রাজদ্রোহের অভিযোগে সরকারী নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় তখন সাময়িক কারণে আবহাওয়া অত্যন্ত ঘুলিয়ে উঠেছিল। বইটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অনুকূলে কিছু লেখবার জন্য শরৎচন্দ্রের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে কবি তাঁর অনুজ সতীর্থের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেননি, আসলে যেটা করতে চেয়েছিলেন তা একটা নীতি বা আদর্শের উপর গুরুত্ব আরোপ। এই নীতি বা আদর্শের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, থাকাই স্বাভাবিক ; কিন্তু তার জন্য কবির উদ্দেশ্যের প্রতি অভিসন্ধি আরোপ করাটা উচিত হয় না। শরৎচন্দ্রের প্রতি কবির মনে অসূয়ার ভাবই যদি থাকবে তো এরই কয়েক বছর পরে শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে কবি যেরূপ উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করে বাণী পাঠিয়েছিলেন তা পাঠানো কখনই সম্ভব হতো না। আমি যথাস্থানে এই ভাষণটি থেকে উদ্ধৃতি দেব, আপাতত শুধু এই বলা যায় যে, মহাপুরুষদের মনস্তত্ত্বের পরিমাপ সাধারণের মাপকাঠিতে না করাই ভাল—তাতে বিচারভ্রান্তি ঘটবার সম্ভাবনা পদে পদে।

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে প্রথম অবহিত হন ১৩১৪ সালে। সেই সময় শ্রীযুক্তা সরলা দেবী সম্পাদিত ভারতী পত্রিকায় পর পর দুই সংখ্যায় নামহীন ভাবে বড়দিদি উপন্যাসের কিস্তি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। লেখাটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অনেকেই জল্পনা করতে থাকেন কে এই লেখক এবং একাধিক জনের ভুল করে ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথই নাম গোপন করে রচনাটি লিখেছেন—কবি ভিন্ন অন্য কারও কলমে এমন চমৎকার গল্প উৎরানো সম্ভব নয়। কেউ কেউ সোজা কবির দরবারে ছুটে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন. লেখাটিতে তিনি তাঁর নাম দেননি কেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি, পরে সচকিত হয়ে কৌতূহল বশে লেখাটি

আনিয়ে পড়ে বুঝতে পারেন বাংলা কথাসাহিত্যে এক নূতন প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে। তাকে কালে-দিনে সবাইকেই স্বীকার করতে হবে। খোঁজ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পরিচয় জানতে পান, সেই থেকে দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কের সূচনা। সাক্ষাৎ সম্পর্কের না হলেও (কারণ শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনপ্রবাসী) মানসিক অবহিতির সম্পর্কের। রতনেই রতন চিনতে পারে। শক্তিমানেই শুধু অন্য শক্তিমানের শক্তির অস্তিত্ব টের পায়। এর পর থেকে কবির পক্ষে শরৎচন্দ্রকে অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করার আর কোন উপায় রইল না। প্রতিভাবান অনুজের সম্পর্কে প্রতিভাবান অগ্রজের এই সচেতনতা ঈর্ষার কোঠায় পড়ে না, এটি প্রীতিমণ্ডিত গুণগ্রাহিতারই রকমফের মাত্র।

অন্যপক্ষে শরৎচন্দ্র ছিলেন অন্তরে অন্তরে কবির পরম ভক্ত। বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা একাধিক পত্র ও অন্য সূত্র থেকেও জানতে পারা যায় শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকতে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও কাব্য গভীর আগ্রহ ভরে অনুশীলন করেছিলেন, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গল্পোপন্যাস তিনি তন্ন তন্ন করে পড়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের স্টাইলের উপর রবীন্দ্ররচনার প্রভাব একটু মনোযোগী হলেই অনুভব করা যায়। এই প্রভাব আর কিছুই নয়, দীর্ঘকালস্থায়ী অভিনিবেশ ও সশ্রদ্ধ রবীন্দ্রচর্চার ফল। শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন প্রবাসকালে রবীন্দ্রনাথ একবার রেঙ্গুন শহরে পদার্পণ করেছিলেন। রেঙ্গুন-প্রবাসী ভারতীয় ও বাঙালীদের পক্ষ থেকে তাঁকে যে সংবর্ধনা করা হয় তার মানপত্রটি লিখে দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র, যদিও নিজে তিনি সেটি পাঠ করেননি। তাঁর স্বভাব-সলজ্জতাই এই আত্মগোপনকামী নেপথ্যচারিতার কারণ। পরেও একাধিক উপলক্ষে শরৎচন্দ্র মানপত্রে ও ভাষণে কবিগুরুর প্রশস্তি কীর্তন করেছেন, চিঠিতে কবির প্রতি প্রাণের শ্রেষ্ঠ অনুরাগ ও ভক্তি নিবেদন করেছেন। কবিকে তিনি কী গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন এ সব নানা পরিচয়িকা তার প্রমাণ বহন করছে।

তবে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মাঝে কিছুদিন দুইয়ের সম্পর্কের ভিতর কিছু মালিন্যের খাদ প্রবেশ করেছিল। ভুল-বোঝাবুঝি থেকে এই মালিন্যের জন্ম। ভুল-বোঝাবুঝির উদ্ভব হয়েছিল রাজনীতিগত দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, পথের দাবী সম্পর্কিত মতবিরোধ এবং কয়েকটি সাহিত্যিক বিতর্ককে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথ যখন পথের দাবীর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবীর অনুকূলে লেখনী ধারণ করতে

অস্বীকার করলেন তখন শরৎচন্দ্র খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে নিজ বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে আত্মপক্ষ সমর্থনে একটি পত্র লিখেছিলেন। বন্ধুদের পরামর্শে সে পত্র অবশ্য শেষ পর্যন্ত ডাকে দেননি। পত্রটির বয়ান এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রকাশিত শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহের ত্রয়োদশ সম্ভারের উপসংহার ভাগে পত্রসঙ্কলন অংশে মুদ্রিত আছে। জিজ্ঞাসু পাঠক সেই বয়ানটির উপর চোখ বুললে দেখতে পাবেন আপন বক্তব্যে অবিচলিত থাকার দৃঢ়তাযুক্ত প্রত্যয়শীলতার সঙ্গে বিনম্র শ্রদ্ধার কী চমৎকার পাশাপাশি সহাবস্থান। কবির প্রত্যাখ্যানে ক্ষুব্ধ, এমনকি উত্তেজিত বোধ করবার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র প্রত্যুত্তরে কবির উদ্দেশে একটিও রূঢ় শব্দ প্রয়োগ করেননি। এই থেকেই বোঝা যায় কবির প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল। সাময়িক মতভেদের আলোড়নে সেই শ্রদ্ধা হয়তো ক্ষণিকের জন্য ঘুলিয়ে উঠেছে কিন্তু সময়ের ব্যবধানেই আবার অবস্থা শান্ত হতে শ্রদ্ধা তার পূর্বস্থিতিতে ফিরে এসেছে, থিতানো ঘোলাজল পুনরায় নির্মলতা প্রাপ্ত হয়েছে।

কবি লিখিত বিচিত্রা মাসিকের 'সাহিত্যের ধর্ম' প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করে আজ থেকে আটচল্লিশ বছর আগে বাংলা সাহিত্যে প্রচণ্ড বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু ছাত্র মাত্রেই জানেন এই বিতর্কের উপলক্ষে বাংলার সাহিত্যিক কুল পরস্পর-বিরুদ্ধ দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ শিবির-ভুক্ত হয়ে কবির প্রবন্ধের জবাবে বঙ্গবাণী মাসিক পত্রিকায় 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামে একটি কড়া নিবন্ধ লেখেন। তাতে কবিকে তাক করে অনেক চোখা চোখা কথার বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। অস্বীকার করবার যো নেই যে, এই সব বাক্যশরের কতক যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে ছোঁড়া হয়েছিল—কয়েকটি আক্রমণে তরবারির আঘাত কোমরবন্ধের নিম্নাঙ্গ স্পর্শ করেছিল। মামলাটা ছিল সাহিত্যের শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্ন নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তদানীন্তন কিছু তরুণ লেখকের সমালোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের লেখায় সাহিত্যধর্মের সীমানা মেনে চলছেন না বরং কোন কোন স্থলে স্পষ্টতঃই বে-আব্রুতার প্রশ্রয় দিচ্ছেন। যদিও কবির প্রতিবাদ ছিল খুবই মৃদু ধরনের, তা হলেও এইটেই নবীন সাহিত্যের ভীমরুলের চাকে ঘা দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। শরৎচন্দ্র নবীনদের পক্ষে লেখনী ধারণ করে

কবিকে এক হাত নেবার চেষ্টা করেছিলেন। কথাগুলি কিছু তীক্ষ্ণবিদ্রূপাত্মক হয়ে পড়েছিল। সেইটেকেই আমি উপরে বাক্‌যুদ্ধের নিয়মলঙ্ঘন বলে বর্ণনা করেছি।

কিন্তু শরৎচন্দ্র অবিবেকী ছিলেন না। পরে শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীকে লেখা এক চিঠিতে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পথের দাবী সংক্রান্ত অনুরোধের প্রত্যাখ্যান তাঁকে গভীরভাবে বেজেছিল বলেই বোধ করি বাদানুবাদের বেলায় কবির সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে কিছু ঝাঁঝ প্রকাশ পেয়েছিল। "ঠিক বলতে পারিনে হয়ত এই কথা আমার মনের মধ্যে অলক্ষ্যে ছিল যখন সাহিত্যের রীতি-নীতি লিখি। তাতেই বোধ হয় কোথাও কোন জায়গায় একটু আধটু তীব্রতার ঝাঁঝ এসে গেছে।"

তাছাড়া এ সম্বন্ধে আরও একটু কথা আছে। শরৎচন্দ্র যখন সাহিত্যের ধর্মের বিতর্কের সূত্রে কবিকে ঝাঁঝালো ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন তখন তিনি সমালোচিত তরুণ লেখকদের সব লেখা পড়েননি। আক্রমণের পিছনে যত না তথ্যের জোর ছিল তার চেয়ে ভাবাবেগের ভূমিকা ছিল বেশী। পরে শরৎচন্দ্র এক বছর যাবৎ বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে তরুণ সাহিত্যিকদের লেখা-পত্র পড়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার যথেষ্ট সঙ্গত ভিত্তি ছিল। তরুণ লেখকেরা সত্যই বড় বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর ভুল স্বীকার করেছেন নবীন লেখকদের সভায় প্রদত্ত একটি ভাষণে, যার বয়ান মুদ্রিত হয়েছিল ১৩৩৭ সালে আশ্বিন মাসের বসুমতীতে। তাতে এই কথাগুলি আছে ঃ "আজ রবীন্দ্রনাথের সেই কঠোর কথাটাই ('সাহিত্যের ধর্ম' প্রবন্ধের বক্তব্য) আমার বারম্বার মনে পড়ে। সেদিন অনেকেই মনে করলেন যেন আমি তাঁর কথার পাল্টা উত্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু তা করিনি। কোন দিন করবো বলে মনে করি না। সেদিন তাঁর কথা আমার এতটা না বললেও হতো। কারণ, অতখানি বোধ করি অত্যন্ত কঠোর ঠেকেছিল। মনে হয়েছিল সত্য ছিল না। কিন্তু এক বৎসর পরে এ আর আমি বলতে পারিনে।" (স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃ. ২১২)।

এই থেকেই বোঝা যায় শরৎচন্দ্রের মন কত সত্যনিষ্ঠ ছিল। ভুল যখন তাঁর চোখে ধরা পড়লো তখন তা কবুল করতে তাঁর মুহূর্তেকের দ্বিধা হয়নি এবং অকপটে অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। মহতেরই এটা লক্ষণ।

এদিকে শরৎচন্দ্রের প্রতি কবির স্নেহ নানা সময়ে নানা ভাবে প্রকাশ

পেয়েছে। সত্য বটে পথের দাবীর উপর প্রযুক্ত সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে বেশ কিছুটা নিরাশ করেছিলেন, কিন্তু যে-পত্রে তিনি এই অস্বীকারের কথা জানিয়েছিলেন সেই পত্রেরই শেষাংশে শরৎচন্দ্রের রচনাশক্তি সম্বন্ধে এই কথাগুলি ছিল ঃ "কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজ রাজা যদি বই প্রচার বন্ধ না করে দিত তাহলে এই বোঝা যেত যে, সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।"

এরই বছর ছয়েক বাদে, ১৩৩৯ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে, দেশবাসীর পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁকে টাউন হলে অভিনন্দন জানানো হয়। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্য করবার কথা ছিল কিন্তু অনিবার্য কারণে আসতে না পারায় তিনি একটি আশীর্বাণী পাঠান। সেই বাণীতে কবি উচ্ছ্বসিত ভাষায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভার প্রশংসা করেছেন এবং আরও জানিয়েছেন জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' নাটিকাটি তিনি তাঁরই নামে উৎসর্গ করেছেন। এই শেষ নয়। ওই আশীর্বাণীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে একখানি ব্যক্তিগত পত্র ছিল। তাতে এই ছত্রগুলি ছিল ঃ "তোমার প্রতিভার দ্বারা দেশের হৃদয়কে তুমি জয় করেছ, দেশের গভীর অন্তরে তোমার প্রবেশাধিকার। তোমার লেখনী বাঙালীর চিত্ততন্ত্রকে হাসি ও অশ্রুর নবতর ও গভীরতর ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করে তুলেছে।"

শরৎচন্দ্রের ৬১তম জন্মতিথি উপলক্ষে রবিবাসরের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করা হয়। এই অভিনন্দন সভায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত থেকে লিখিত অভিভাষণে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেছিলেন। ভাষণের একাংশ এইরূপ ঃ "আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার, কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেননি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে উচ্ছ্বসিত। শুধু কথাসাহিত্যের পথে নয় নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য

বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।"

অন্যপক্ষে শরৎচন্দ্র কোন্ ভাষায় ও কী ভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন তাও অনুধাবনযোগ্য। কবির সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীর পক্ষ থেকে আয়োজিত জন্মজয়ন্তী সভার সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন : "কবির জীবনের সপ্ততি বৎসর বয়স পূর্ণ হলো বিধাতার এই আশীর্বাদ শুধু আমাদিগকে নয়, সমস্ত মানবজাতিকে ধন্য করেছে। সৌভাগ্যের এই স্মৃতিকে আনন্দোৎসবে মধুর ও উজ্জ্বল করে আমরা উত্তরকালের জন্য রেখে যেতে চাই এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও এই পরিচয়টুকু দিয়ে যাবো যে, কবির শুধু কাব্যেই নয় তাঁকে আমরা চোখে দেখেছি, তাঁর কথা কানে শুনেছি, তাঁর আসনের চারিধারে ঘিরে বসবার ভাগ্য আমাদের ঘটেছে। মনে হয়, সেদিন আমাদের উদ্দেশেও তারা নমস্কার জানাবে।" সেই সভারই জন্য লিখিত মানপত্রে শরৎচন্দ্র কবিকে অভিনন্দিত করেছেন এইভাবে : "তোমার কাছে আমরা পেয়েছি অনেক কিন্তু তোমার হাত দিয়ে বিশ্বকে দিয়েছিও অনেক।"

এই সব উক্তির মধ্য দিয়ে কবির প্রতি শরৎচন্দ্রের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা একজন শ্রেষ্ঠ ভক্তের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে। অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের প্রতিও কবির একান্ত স্নেহশীল মনোভাব অব্যক্ত থাকেনি। তার পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, সাময়িক বাদ-প্রতিবাদের আঁধিতে এই দুই দিক্‌পাল সাহিত্যস্রষ্টা এঁদের একের প্রতি অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীকে মোটেই আচ্ছন্ন বা অভিভূত হতে দেননি। সাময়িক কুয়াশার মালিন্য ভেদ করে দুইয়ের যে চিত্র আমাদের মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয় তা একদিকে অপরিসীম স্নেহ অন্যদিকে গভীর শ্রদ্ধার বিচ্ছুরণে দীপ্ত। সেই ছবির ভিতর দুইয়ের মহত্ত্বও সমান প্রকটিত।

॥ ১১ ॥

রাজনৈতিক চিন্তা

পূর্ব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে-মতভেদের ইঙ্গিত করা হয়েছে তা মূলতঃ রাজনীতির প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক ধ্যান ধারণায় যথেষ্ট পার্থক্য ছিল সেটা এই দুই দিক্‌পাল লেখকের রচনার ধারা এবং জীবনের ছক বিচার করলেই ধরতে পারা যায়। আপাতত রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনোযোগের বিষয়ীভূত নন ; ভিন্ন কোন উপলক্ষে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এই রচনার আলোচ্য শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক মতাদর্শ, যা কিনা তাঁর সৃষ্টিধর্মী লেখা এবং প্রবন্ধ-সাহিত্য এই দুইয়ের মধ্যেই প্রতিফলিত দেখা যায়।

দুটি বইকে এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে প্রতিনিধিমূলক মনে করা যায়—পথের দাবী উপন্যাস ও তরুণের বিদ্রোহ প্রবন্ধগ্রন্থ। অন্যান্য প্রবন্ধ-নিবন্ধের মধ্যেও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার আদল খুঁজে পাওয়া যায়, তবে চিন্তাচর্চার দিক দিয়ে তরুণের বিদ্রোহ বইটিই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমে পথের দাবী উপন্যাসের প্রসঙ্গ ধরা যাক।

পথের দাবী উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসে। তার আগে একাদিক্রমে চার বছর ধরে মাঝে মাঝে বিরতিছেদ দিয়ে উপন্যাসটি 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসটি ইংরেজ সরকার কর্তৃক রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। তের বছর বইটির উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। বইখানার রাজরোষ মুক্ত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে।

উপন্যাসখানাতে কী এমন ছিল যার জন্য ইংরেজ সরকারের পক্ষে বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাত-তাড়াতাড়ি তার কণ্ঠরোধ করবার প্রয়োজন ঘটলো ? রাজরোষ তো অপরাধের এক সাধারণ বর্ণনা, বর্ণিত রাজরোষের প্রকৃতি কী ছিল সেইটেই বিবেচ্য।

পথের দাবী উপন্যাস পড়লে বোঝা যায় লেখক এতে কেবলমাত্র এদেশে

ইংরেজ সরকারের স্বরূপ বর্ণন করেই ক্ষান্ত থাকেননি, প্রকৃতপক্ষে দেশে দেশে ইংরেজ প্রভুত্বের যথার্থ রূপটিকে উন্মোচন করে দেখানোতেও সমান সচেষ্ট হয়েছেন। শরৎচন্দ্রের তীক্ষ্ণ সমালোচনাপ্রবণ মনের ব্যবচ্ছেদী শলাকায় বার বার বিদ্ধ হয়ে বিশ্বের দিকে দিকে ছড়ানো উপনিবেশগুলিতে ক্রিয়াশীল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ফালাফালা হয়ে গেছে। এই সাম্রাজ্যবাদের চিরাভ্যস্ত নিষ্ঠুরতা কুটিলতা অত্যাচার শোষণ লুণ্ঠনতৎপরতা কিছুই রাজনীতিসচেতন সূক্ষ্মদর্শী লেখকের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি; তাঁর সুতীব্র ভর্ৎসনা ও নিন্দা নির্মম বজ্রাগ্নির মত নেমে এসেছে ওই সাম্রাজ্যবাদকে ধিক্কৃত করে পদে পদে—যেখানেই এমনতর ধিক্কারবাণীর উপলক্ষ উপস্থিত হয়েছে তার সুযোগ নিয়ে। উপন্যাসের বিপ্লবী চরিত্র সব্যসাচীকে করা হয়েছে এই সুতীক্ষ্ণ সমালোচনার মুখপাত্র, যদিও বুঝতে অসুবিধা হয় না সব্যসাচীর অনেক কথাই শরৎচন্দ্রের নিজেরও কথা, শরৎচন্দ্রের অনুভবটাই বহুলাংশে সব্যসাচীর বাচনিক পরিবেশিত হয়েছে বইয়ের মধ্যে। সব্যসাচীর কথাগুলি যদি কাল্পনিক হতো, নিছক উপন্যাস সৃষ্টির প্রয়োজনে কাহিনীর ধারায় সংযোজিত হতো, তাহলে পাঠকের মনের উপর তার এমন প্রভাব পড়তো কিনা সন্দেহ। কিন্তু যারা এই বই বাজেয়াপ্ত করার আদেশ ঘোষণা করেছিল তাদের এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, এ বই বাঙালীর সংগ্রামী চেতনাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে, সুতরাং রাজদ্রোহের অভিযোগ খাড়া করে বইখানির প্রচার এখনি বন্ধ করে দেওয়া দরকার। সরকারী কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা যতই অবাঞ্ছিত ও অন্যায় হোক, তাদের স্বার্থের দিক থেকে তারা যে খুব ভুল করেছিল তা মনে হয় না। উপযুক্ত বইয়ের উপরেই তাদের খরদৃষ্টি পতিত হয়েছিল, কেননা বইখানার বৈপ্লবিক সম্ভাবনা ছিল প্রভূত আর সেই উদ্দেশ্যেই বইখানা লেখা হয়েছিল।

অবশ্য শিল্পের মানদণ্ডে বিচার করলে উপন্যাসখানাকে পুরাপুরি সন্তোষজনক মনে করা যায় না। (শরৎচন্দ্র বইখানাকে করতে চেয়েছিলেন একটি বৈপ্লবিক উপন্যাস কিন্তু এদেশের জলবায়ুর গুণে অথবা দোষে সেটি হয়ে উঠেছে শেষ পর্যন্ত একটি মানবিক উপন্যাস)—অপূর্ব-ভারতীর ভাবাবেগসমৃদ্ধ প্রেম সব্যসাচীর বহুযত্নে তৈরী সাধের বিপ্লবের আয়োজনকে মধ্যপথে কাচিয়ে দিয়েছে। বিপ্লবের আপসহীনতা নরনারীর রোমান্টিক ভালবাসার সংস্পর্শে এসে অনেকখানি তরল আর নমনীয় হয়ে পড়েছে। উপন্যাসে জৈবপ্রেমের

চিত্রণ দেখাতেই হবে এমন কোন কথা নেই। অন্ততঃ যে-উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ক্রূর-কুটিল স্বরূপের উন্মোচন ও বিপ্লবের উদ্‌ঘোষণ, সে-বইয়ের পক্ষে এমনতর প্রেমের পরিবেশনা অত্যাবশ্যক ছিল না। আদর্শের সমপ্রাণতা ও কর্মের সমানত্বের মধ্য দিয়ে যে-প্রেম গড়ে ওঠে তাকে বিপ্লবী উপন্যাসের আখ্যানভাগের উপজীব্য রূপে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু অপূর্ব-ভারতীর প্রেম সে জাতের নয়। এই প্রেম বিপ্লবকে এগিয়ে দেয় না, পেছু টেনে রাখে। কাজেই অপূর্ব-ভারতী জুটির ভালবাসার মানবিক কাহিনী পথের দাবী উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেনি, তার মূল্যাপকর্ষ ঘটাবার হেতু হয়েছে। ম্যাক্সিম গর্কির মাদার বিপ্লবী উপন্যাস—সংগ্রামী রাজনীতির অভীপ্সায় ভরা। তিনি কিন্তু নরনারীর জৈব আকর্ষণভিত্তিক হৃদয়সংবাদকে তাঁর সেই উপন্যাসে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেননি, আগাগোড়া বিপ্লবের চড়া সুরে উপন্যাসের কাহিনীটিকে বেঁধে রেখেছেন। শরৎচন্দ্র কেন যে পথের দাবী উপন্যাস লিখতে গিয়ে এই রীতির অন্যথাচরণ করলেন ভাল বোঝা যায় না। খুব সম্ভব বাঙালী মনের রোমান্টিক মাধুর্যকে মর্যাদা দিতে গিয়েই এ রকমটা করা হয়েছে। কিন্তু তার ফলে বইটি আর পুরাপুরি বৈপ্লবিক থাকেনি, লেখকের অজ্ঞাতসারেই মানবিকতার খাতে চালান হয়ে গিয়েছে।

যাই হোক এ তো হলো বইয়ের শিল্পবিচার। তা বলে পথের দাবী উপন্যাসের সব্যসাচীর মুখের কথাগুলির দাম কমে যায় না। কিংবা তারই বিপ্লবী দলের প্রচ্ছন্ন সদস্য নীলকান্ত যোশীর শিষ্য মারাঠী যুবক রামদাস তলোয়ারকরের ভূমিকা বা বক্তব্য মিথ্যে হয়ে যায় না। ওরা দুজনাই এদেশে ইংরেজ রাজত্বের আপসহীন শত্রু। তাদের ওই দ্ব্যর্থহীন বৈরিতার মনোভাব এই বইয়ের কোথাও গোপন থাকেনি—দীপ্ত মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রালোকে কিছুই যেমন ঢাকা পড়ে না, তেমনি তাদের ইংরেজ-বিমুখতাও অত্যন্ত রূঢ়-রুক্ষ সত্যের ন্যায় স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে বারংবার। এমন অকুণ্ঠিত বলিষ্ঠ নির্ভীক ঘোষণার সামনে এদেশের তদানীন্তন পরদেশী শাসকশক্তি বিচলিত বোধ করবে না তো কিসে করবে ?

দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই শরৎচন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায় সম্পর্কে ভুল ধারণা করবার কোন অবকাশ থাকবে না। তিনি এই দুটি চরিত্রের সঙ্গে বলতে গেলে নিজেকে একাত্মভাবে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। আর সেখানেই বইটির শিল্পগত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সত্যিকারের জোর। রামদাস তলোয়ারকরের

বক্তব্য দিয়েই শুরু করা যাক। অপূর্ব রেঙ্গুন থেকে ভামোর উদ্দেশে ট্রেন ভ্রমণ কালে তলোয়ারকরের কতকগুলি কথা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছিল। রেঙ্গুন এসে অবধি অপূর্বর লাঞ্ছনার সীমা-পরিসীমা ছিল না। এই ট্রেনে ভ্রমণকালেও প্রথম শ্রেণীর আরোহী হওয়া সত্ত্বেও সে যেহেতু গোরা আরোহী নয় সেই কারণে রেল কর্মচারীর দ্বারা অযথা অপমানিত হয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রামদাসের কথাগুলি একটা বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে তার সামনে প্রতিভাত হলো। ব্রহ্মদেশের পূর্ব-ইতিহাস ওই কথাগুলির সঙ্গে জড়ানো, কী ভাবে ইংরেজ বর্মাকে আপন কুক্ষিগত করেছিল তার ইতিহাস। 'বাবুজী, শুধু কেবল শোভা সৌন্দর্যই নয়, প্রকৃতি মাতার দেওয়া এত বড় সম্পদও কম দেশে আছে! ইহার বন ও অরণ্য অপরিমেয়, মাটির মধ্যে ইহার অফুরন্ত তেলের প্রস্রবণ, ইহার মহামূল্য রত্নখনির মূল্য নিরূপিত হয় না, আর ওই যে আকাশচুম্বি মহাদ্রুমের সারি, জগতে ইহার তুলনা কোথায়? সে বেশি দিনের কথা নয়, সংবাদ পাইয়া একদিন ইংরাজের লুব্ধদৃষ্টি ইহারই প্রতি একেবারে একান্ত হইয়া পড়িল। তাহার অনিবার্য পরিণাম অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সোজা। বিবাদ বাধিল, মানোয়ারি জাহাজ আসিল, বন্দুক কামান আসিল, সৈন্য সামন্ত আসিল, লড়াই বাধিল, যুদ্ধে হারিয়া দুর্বল অক্ষম রাজা নির্বাসিত হইলেন এবং তাঁহাদের রাণীদের গায়ের গহনা বেচিয়া লড়াইয়ের খরচ আদায় হইল। অতঃপর দেশের ও দশের কল্যাণে, মানবতার কল্যাণে, সভ্যতা ও ন্যায়ধর্মের কল্যাণে ইংরাজ রাজশক্তি বিজিত দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া তাহাদের অশেষবিধ ভালো করিতে কায়মনে লাগিয়া গেলেন।'

শেষের কথা কয়টির প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। রামদাসের উদ্দিষ্ট বক্তব্য অতি পরিষ্কার। আর সেই বক্তব্যের আলোড়নে অপূর্বর মনে যে-কথাগুলি স্বতঃই ভেসে উঠলো তা হলো এই: 'তাই ত আজ তথায় সতর্কতার অবধি নাই, তাই ত সেই বিজিত দেশের পুলিশ কর্মচারী তাহারই মত আর এক পরাধীন দেশের নিরীহ ব্যক্তিকে বারংবার ঘুম ভাঙাইয়া নিঃসংকোচে বলিতে পারিল, তুমি ত সাহেব নও যে তোমাকে অপমান করিতে আমার বাধিবে?' অপূর্ব মনে মনে কহিল, 'বটেই ত, বটেই ত! ইহার অধিক আমাকে সে কি দিবে? ইহার বড় আমিই বা কোন্ মুখে তাহার কাছে দাবী করিব?'

ভারতী একদিন সব্যসাচীর আবাসস্থলের ভয়ঙ্করতার উল্লেখ করে বিস্ময় ও তিরস্কারমিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, " 'দাদা ওপারের এমনি একটা ভয়ঙ্কর স্থান থেকে আর একটা তেমনি ভয়ঙ্কর জায়গায় নিয়ে এলে। বাঘ-ভালুকের মত এ-ছাড়া কি তোমরা আর কোথাও থাকতে জানো না? আর কিছু ভয় না কর সাপের ভয়টা ত করতে হয়?'

"ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, 'সাপ বিলাত থেকে আসেনি দিদি, তাদের ধর্মজ্ঞান আছে, বিনা অপরাধে কামড়ায় না।......আর বাঘ-ভালুক বোন? কতদিন ভাবি, এই ভারতবর্ষে মানুষ না থেকে যদি কেবল বাঘ-ভালুকই থাকতো! হয়ত বিদেশ থেকে শিকার করতে এরা আসতো, কিন্তু এমন অহর্নিশি রক্ত শোষণের জন্য কামড়ে পড়ে থাকত না।' "

ইউরোপীয়, বিশেষ, ইংরেজের বিরুদ্ধে কী অপরিসীম ঘৃণা এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে তা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়। ভারতীর এত বিদ্বেষ আর ঘৃণার অভিব্যক্তি ভাল লাগে না। সে যদিও 'পথের দাবী' প্রতিষ্ঠানের সভ্য এবং বিপ্লবের মন্ত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ, তাহলেও দেশ স্বাধীন করবার জন্য রক্তারক্তি কাটাকাটির পথ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই এ কথা ভাবতে তার মন সায় দেয় না। "সমস্ত জাতি-নির্বিশেষে কাহারও এতখানি বিদ্বেষ তাহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিত। বিশেষ করিয়া এই মানুষটির (সব্যসাচীর) এত বড় বিশাল বক্ষতল হইতে যখন গরল উছলিয়া উঠিত, তখন দুই চক্ষু তাহার জলে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। নিজের মনে প্রাণপণে বলিতে থাকিত, ইহা কখনও সত্য নয়, কিছুতে সত্য নয়। এমন হইতেই পারে না।" অন্যত্র ভারতী সব্যসাচীকে বলছে, 'ভারতের মুক্তি আমরা চাই —অকপটে, অসঙ্কোচে, মুক্তকণ্ঠে চাই। দুর্বল, পীড়িত, ক্ষুধিত ভারতবাসীর অন্নবস্ত্র চাই। মনুষ্য-জন্ম নিয়ে মানুষের একমাত্র কাম্য স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধি করতে চাই। ভগবানের এত বড় সত্যে উপস্থিত হবার এই নিষ্ঠুর পথ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই, এ আমি কোনমতেই ভাবতে পারিনে। পৃথিবী ঘুরে তুমি শুধু এই পথের খবরটাই জেনে এসেচ,......কিন্তু বিশ্ব-মানবের একান্ত শুভ-বুদ্ধি, তার অনন্ত বুদ্ধির ধারা কি এমনই নিঃশেষ হয়ে গেছে যে, এই রক্ত-রেখা ছাড়া আর কোন পথের সন্ধানই কোনদিন তার চোখে পড়বে না? এমন বিধান কিছুতেই সত্য হতে পারে না। দাদা, মনুষ্যত্বের এত বড় পরিপূর্ণতা তুমি ছাড়া আর কোথাও আমি দেখিনি,—

নিষ্ঠুরতার এই বারংবার চলা-পথে তুমি আর চোলো না। দুয়ার হয়ত আজও রুদ্ধ আছে, তাই তুমি আমাদের জন্য খুলে দাও—এ জগতের সবাইকে ভালবেসে আমরা তোমাকে অনুসরণ করে চলি।'

স্পষ্টতঃই সব্যসাচী আর ভারতীর পথ ভিন্ন। একজন বিপ্লবের রক্ত-রঞ্জিত দুরূহ পথ বেছে নিয়েছে, অন্যজনার চোখে সেই পথ বিভীষিকার আতঙ্ক সৃষ্টি করে; যদিও দুইয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য এক: ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, এবং পরিণামে মানবজাতির মুক্তি। কিন্তু সব্যসাচীর হৃদয়ে সমগ্র মানব-জাতির জন্য এত বিশাল প্রেম থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন জাতীয় মুক্তি তথা মানবমুক্তি সাধনে রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ ছাড়া আর কোন পথ পরিক্রমায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না? একটি মাত্র উপায়ের উপরেই কেন তাঁর চিত্তের সমগ্র মনোযোগ ও পক্ষপাত অর্পিত?

সেটি বুঝতে হলে সব্যসাচীর প্রথম জীবনের আখ্যায়িকায় ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। তিনি ইংরেজের প্রতি স্বতঃই বিরূপতা নিয়ে জন্মাননি, অভিজ্ঞতাই তাঁকে এদেশে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে, তাঁর মনে ওই শাসনের বিরুদ্ধে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। পরাধীনতার মর্মযাতনা ও অপমান যে কাকে বলে তা তিনি নিজ জীবনেই উপলব্ধি করেছেন। ব'লে তাঁর ওই মনোভাবের ব্যাখ্যা করে তিনি ভারতীকে তাঁর এক জ্যাঠতুত দাদার গল্প শুনিয়ে ছিলেন, যে দাদা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র আর অসহায় অবস্থায় ডাকাতের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন, ডাকাতের আগমন-সংবাদ পূর্বে জানা থাকা সত্ত্বেও ডাকাতের প্রতিরোধের জন্য থানার সাহায্য চেয়েও সে-সাহায্য পাননি। এক অত্যাচারী পুলিশ ইনস্পেক্টরের কান মলে দেবার জন্য তাঁর দু'মাস জেল হয়েছিল, সেই অপরাধে জিলার সাহেব-ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর হাতে বন্দুক তুলে দিতে অস্বীকার করে, ফলে একপ্রকার অভিমান বশেই তিনি স্বেচ্ছায় ডাকাতের গুলির সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন। সেই থেকে সব্যসাচী ইংরেজের ক্ষমাহীন বৈরী আর ওই ইংরেজকে এ দেশ থেকে উৎখাত করাই তাঁর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান সাধনা। 'ভারতী, আমার দেশ গেছে বলেই আমি এদের শত্রু নই। একদিন মুসলমানের হাতেও এ দেশ গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত মনুষ্যত্বের এতবড় পরম শত্রু জগতের আর নেই। স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের মজ্জাগত সংস্কার। এই এদের ব্যবসা, এই এদের

মূলধন। যদি পারো দেশের নর-নারীকে শুধু এই সত্যটাই শিখিয়ে দিও।'

দাদার হত্যায় সব্যসাচীর মনে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিরোধের সংকল্প জেগে উঠেছিল, সে সংকল্পের দীপশিখা আর কখনও নেভেনি, বরং বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত তাল রেখে তা আরও অনেক বেশী প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। কল্পিত ঘটনার এই ছাঁচ লেনিনের জীবনের বাস্তব ঘটনার ছাঁচকে স্মরণ করিয়ে দেয়। লেনিনও জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে অনমনীয় সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন কৈশোরে স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্রের হাতে তাঁর দাদার শোচনীয় হত্যার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। লেনিনের জীবনে সেই সংগ্রামের আর কখনও বিরাম হয়নি পরিণামে জয়যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত। রাশিয়ার বুক থেকে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ করে তবে তিনি দেশ সংগঠনের কাজে মন দিতে পেরেছিলেন—তার আগে নয়। শরৎচন্দ্র লেনিনের জীবনধারার সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত ছিলেন, তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীও তিনি পাঠ করেছিলেন তার আভ্যন্তর প্রমাণ আছে। রাজনৈতিক বিজ্ঞান তাকে স্বতঃই আকৃষ্ট করত, তাঁর নিজমুখের স্বীকৃতি থেকেই সে কথা জানতে পারা যায়। হয়ত সব্যসাচী চরিত্রের পরিকল্পনায় লেনিনের জীবনবৃত্তের ছাঁচ তাঁর অজ্ঞাতসারেই তাঁকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করে থাকবে।

ভারতীর শান্তি ও অহিংসার ক্রমাগত মাহাত্ম্য কীর্তনে অধৈর্য হয়ে এক সময় সব্যসাচী বলেই ফেলেন, 'শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন কারা প্রচার করেছে জানো? পরের শান্তি হরণ ক'রে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যামন্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত নর-নারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে করে তাদের এমন করে তুলেছে যে, আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে উঠে ভাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল! বাঁধা গরু অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেচ? সে দাঁড়িয়ে মরে তবু সেই জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে মনিবের শান্তি নষ্ট করে না।...... না ভারতী, সে হবে না। ও প্রতিষ্ঠান (শান্তি ও অহিংসা তত্ত্ব) যত প্রাচীন, যত পবিত্র, যত সনাতনই হোক,—মানুষের চেয়ে বড় নয়,—আজ সে-সব আমাদের ভেঙে ফেলতেই হবে। ধুলো ত উড়বেই, বালি ত ঝরবেই, ইঁট পাথর খসে মানুষের মাথায় পড়বেই ভারতী, এই ত স্বাভাবিক।'

এর পর আর সব্যসাচীর মানসিকতাকে ভুল করবার কোন যো থাকে না। মানুষের কল্যাণ যারা করতে চায়, নির্বিরোধ শান্তির পথ তাদের জন্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অহিংসা হিংসা পরিহারের অজুহাতে নিষ্ক্রিয়তার নামান্তর মাত্র এবং স্থিতাবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার অনুকূলে কায়েমী স্বার্থবাদীদের চতুর মন্ত্রণা। এ যুক্তিতে ভোলে তারাই, যারা সর্বাবস্থায় ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে ভালবাসে এবং বরাবর ন্যূনতম প্রতিরোধের রাস্তায় চলতে অভ্যস্ত। সব্যসাচী এই রকমের অকার্যকর শান্তি ও অহিংসাকে আঁকড়ে ধরে ভারতের স্বাধীনতাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দিতে প্রস্তুত নন।

তিনি বিপ্লবের যে-কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন তাতে অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী কর্মতৎপরতা আছে, আছে সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা ও বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীর আয়োজন, আছে অন্যান্য দেশের বিপ্লবী আন্দোলন ও তার নেতাদের সঙ্গে যোগস্থাপনের দূর-বিস্তৃত প্রয়াস। ভারতের ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে ইংরেজ শক্তিকে উচ্ছেদ করবার জন্য এত বহুবিস্তারী ব্যাপক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়ত বাস্তবে হয়নি তবে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধকালে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখের চেষ্টার ধারার সঙ্গে পূর্ববর্ণিত কার্যক্রমের কিছু অংশের অন্ততঃ মিল আছে, সে লক্ষণ অতি স্পষ্ট। সমালোচকদের মধ্যে কারও কারও ধারণা, সব্যসাচী চরিত্রের আদল মানবেন্দ্রনাথ রায়ের তৎকালীন ক্রিয়াকলাপের ছক থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কথাটা একেবারে বেঠিক নাও হতে পারে। তবে কোন বিশিষ্ট চরিত্রের পরিকল্পনায় ঔপন্যাসিকেরা তথা নাট্যকারেরা বাস্তব থেকে কত ভাগ গ্রহণ করেন আর কল্পনা থেকেই বা কত অংশ নেন তা নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন। কাল্পনিকতার ক্রিয়া বড়ই সূক্ষ্ম। সৃজনী তৎপরতার মধ্যে বাস্তবের সঙ্গে কাল্পনিকতা এমন অবলীলায় মিশে থাকে যে তাদের দুইকে বিশ্লিষ্ট করা শক্ত। খুব সম্ভব সব্যসাচীর অঙ্কনে দুই প্রভাবই সত্য—তাতে লেনিনও মিশে আছেন, মানবেন্দ্রনাথও মিশে আছেন। দুই এক দেহে লীন হয়ে গেছেন।

বর্ষীয়ান সমালোচক সুপণ্ডিত ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর শরৎচন্দ্র বিষয়ক বইতে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন যে, সব্যসাচীর বিপ্লবের আয়োজন সবটাই ভারতের বাইরে থেকে পরিচালিত, ভারতের স্বাধীনতা

অর্জন চেষ্টার সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। সব্যসাচীর সঙ্গে যদি-বা ভারতের কিছু যোগ আছে, পথের দাবী সংস্থার নেত্রী সুমিত্রার সেটুকু যোগও নেই--সুমিত্রার যে-চরিত্র ও জীবনের পশ্চাৎপট আঁকা হয়েছে তার থেকে তাকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সহানুভূতিগতভাবে যুক্ত মনে করতে পারা একটু কঠিন। এই অভিযোগ বাহ্যতঃ সত্য তবে এই অভিযোগের উত্তরে এই বলা চলে যে, সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের রূপ ও প্রকরণ অনেকটা এই ছাঁচেরই হয়ে থাকে--সব দেশেই এমনতর চেষ্টার পটভূমি আন্তর্জাতিক। রুশ বিপ্লবের মূল নেতা লেনিন ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব সংগঠিত হবার আগে দেশের বাইরে ছিলেন এবং সেখান থেকেই আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন, বিপ্লবের কিছুকাল আগে মাত্র দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এমনি অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই সব্যসাচীর ভারতের বাইরে সংস্থিত থেকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান চেষ্টার মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনকে সার্থক করার উদ্যম অস্বাভাবিক মনে হয় না। এমনতর উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে দেশের সীমানা ছাড়িয়েও দূর দূর অঞ্চলে কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করা কিংবা বিদেশের বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চেষ্টার মধ্যেও এ কথার প্রমাণ রয়েছে।

ভারতের অভ্যন্তরে ইংরেজ শাসনের অপসারণকল্পে বুর্জোয়া জাতীয় নেতৃত্বের অধীনে নিয়মতান্ত্রিক যে-আন্দোলন চলছিল তার কার্যকারিতায় সব্যসাচীর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না, বরং সুযোগ পেলেই ভারতীর কাছে তার হাস্যাস্পদ মধ্যবিত্ত চরিত্র নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। এমনতর মানুষের ধ্যানে বিপ্লবী আন্দোলনের আদর্শ আন্তর্জাতিক হওয়াই প্রত্যাশিত আর তা কার্যতঃ হয়েও ছিল। কী চরিত্র পরিকল্পনায় কী ঘটনার বর্ণনায় শরৎচন্দ্রের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি বিমুখতা অথবা আন্তর্জাতিক সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতি পক্ষপাত কোনটাই অনভিব্যক্ত থাকেনি। তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি পথের দাবী উপন্যাস লেখকের সহানুভূতি অতি স্পষ্ট।

সাম্রাজ্যবাদের মত ইউরোপের ক্রীশ্চান সভ্যতার স্বরূপ সম্পর্কেও লেখকের মনোভাব অনুরূপ আপসহীন। বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় সভ্যতার এমন কঠোর ধিক্কার খুব কমই উচ্চারিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের বিশ্লেষণের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে অন্ততঃ মহাত্মা গান্ধীর হিন্দ্ স্বরাজ (১৯০৯) বইয়ের বিশ্লেষণ

চমৎকার মিলে যাচ্ছে। সব্যসাচী ভারতীকে বলছেন, 'লজ্জাহীন উলঙ্গ স্বার্থ এবং পশু-শক্তির একান্ত প্রাধান্যই এর (ইউরোপীয় ক্রীশ্চান সভ্যতার) মূল মন্ত্র। সভ্যতার নাম দিয়ে দুর্বল, অক্ষমের বিরুদ্ধে এতবড় মুষল মানুষের বুদ্ধি আর ইতিপূর্বে আবিষ্কার করেনি। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখ, ইউরোপের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে কোন দুর্বল জাতিই আজ আর আত্মরক্ষা করতে পারেনি। দেশের মাটি, দেশের সম্পদ থেকে দেশের ছেলেরা বঞ্চিত হয়েছে কোন্ অপরাধে জানো ভারতী? একমাত্র শক্তিহীনতার অপরাধে। অথচ ন্যায়ধর্মই সকলের বড় এবং বিজিতের অশেষ কল্যাণের জন্যেই এই অধীনতার শৃঙ্খল তার পায়ে পরিয়ে সেই পঙ্গুর সর্বপ্রকার দায়িত্ব বহন করাই ইউরোপীয় সভ্যতার চরম কর্তব্য—এই পরম অসত্য লেখায় বক্তৃতায় মিশনারির ধর্মপ্রচারে, ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকে অবিশ্রান্ত প্রচার করাই তোমাদের ক্রীশ্চান সভ্যতার রাজনীতি।'

পথের দাবী উপন্যাসের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, এই বইয়েই প্রথম শরৎচন্দ্র শ্রমিক সমস্যার বিষয়ে তাঁর চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। ফয়ার-মাঠে যেদিন পথের দাবীর প্রথম সভা হয় তার আগের দিন ভারতী অপূর্বকে একপ্রকার তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মজুরদের লাইনের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল মজুররা কিভাবে জীবনযাপন করে তা সরেজমিনে দেখাবার জন্য। দেখে অপূর্বর চক্ষুস্থির, বোধশক্তি স্তম্ভিত। কুলি ব্যারাকের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি সম্পর্কে তার মোটামুটি একটা ধারণা ছিল কিন্তু সে যে এত বীভৎস কদর্য আত্মক্ষয়কর হতে পারে স্বপ্নেও তা সে কল্পনা করতে পারেনি। এই-খানেই সে মানিক মিস্ত্রী, রামিয়া, যদু, পাঁচকড়ি, কালাচাঁদ, দুলাল প্রভৃতি শ্রমিকেরা পশুরও অধম যে দুঃখের জীবন যাপন করে তার সাক্ষাৎ পরিচয় পেল। এই প্রথম অপূর্বর চেতনায় এই ভাবের উপলব্ধি হলো এরা সভ্যতা-প্রদীপের পিলসুজ, তলায় থেকে কালিঝুলি মেখে প্রদীপকে ধারণ করে রেখেছে। রামদাসকে অপূর্ব তার এই বস্তি-দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে রামদাসও ঠিক একই ভাবের অভিব্যক্তি দিলে, বললে, 'বাবুজী, আত্মত্যাগের উৎসই ঐখানে। দেশের সেবার বনেদ ওর 'পরে, ওর নাগাল না পেলে যে আপনার সকল উদ্যম সকল ইচ্ছা মরুভূমির মত দুদিনে শুকিয়ে উঠবে।' ফয়ার-মাঠের বক্তৃতায়ও রামদাস এই ভাবের কথাই আরও সজোরে বললে, শ্রমের গুরুত্ব ও অপরিসীম মূল্যবত্তার ধারণা শ্রোতাদের

অন্তরে মুদ্রিত করে দেবার জন্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলে, 'বিনাশ্রমে সংসারে কিছুই উৎপন্ন হয় না—তাই শ্রমিকও ঠিক তোমাদেরই মত মালিক—ঠিক তোমাদের মতই সকল বস্তু, সকল কারখানার অধিকারী।' আর এই কথা উচ্চারিত হওয়া মাত্রই সর্দার-গোরা গর্জন করে বলল 'স্টপ, এ চলবে না, এতে শান্তিভঙ্গ হবে। এ রাজদ্রোহ।'

আঁতে ঘা লাগলে অর্থাৎ ঠিক মোক্ষম জায়গায় হাত পড়লে কায়েমী স্বার্থবাদীরা কীভাবে আঁতকে ওঠে, এই বর্ণনায় তারই হদিশ মিলছে। বক্তৃতার এই অংশের জন্যই বিশেষ করে রামদাসকে গ্রেপ্তার করা হলো ও মিটিং ভণ্ডুল করে দেওয়া হলো। শরৎচন্দ্র এখানে শ্রমিক-সমস্যার অভ্রান্ত বিশ্লেষণ করেছেন এবং ওই সমস্যার প্রতিকারেরও পথ বাতলেছেন। ঐক্য আর সঙ্ঘশক্তির জাগরণই যে শ্রমিক-মুক্তির একমাত্র উপায় সে কথাটি তাঁর পথনির্দেশনার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। শ্রমিক ও শ্রমের প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাজ-তান্ত্রিক বিশ্লেষণের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এই বিশ্লেষণের মিল আছে।

পথের দাবী উপন্যাসে দুটি চিন্তা পাশাপাশি বয়ে চলেছে—একটি সব্যসাচীর বৈপ্লবিক আদর্শ, অন্যটি ভারতীর মানবিক মতবাদ। এই দুই বিপরীত ধারণার মধ্যে কোন্‌টির প্রতি শরৎচন্দ্রের স্বভাব-পক্ষপাত তা রচনার ধারায় অস্পষ্ট থাকেনি। শরৎচন্দ্র চরিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে সব্যসাচীর সঙ্গে তদ্‌গত হয়ে গিয়েছেন। আর এই তন্ময়তার গুণে সব্যসাচীর মুখ দিয়ে তিনি যা-যা বলিয়েছেন তা তাঁর নিজের কথা বলেই মনে হয়েছে।

তবে শিল্পবিচারের প্রশ্নে, পূর্বেই বলেছি, পথের দাবীর বৈপ্লবিকতা অনেকখানি ফিকে হয়ে গিয়েছে অপূর্ব-ভারতীর প্রেমোপাখ্যানের সংস্পর্শ-দোষে। এই প্রেমকাহিনীকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে বৈপ্লবিকতাকে আড়াল করে মানবতাবাদ প্রধান হয়ে উঠেছে। সব্যসাচীর বৈপ্লবিক ভাব-মূর্তিটিও শেষপর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকেনি, তা মানবিকতার সরণিতে অনেকখানি সরে গেছে, যা খুব সম্ভব গোড়ায় লেখকের অনভিপ্রেত ছিল।

২

শরৎচন্দ্র বর্মা থেকে ফিরে আসার পর অবিভক্ত বাংলায় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি অনেক দিন হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। কংগ্রেসের রাজনীতিতে উপদলীয় মতসংঘাতের ক্ষেত্রে

তিনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও তাঁর ভাবশিষ্য সুভাষচন্দ্রের সমর্থক। এই থেকেও তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর আদল খানিকটা বোঝা যায়। কেননা চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র দুজনাই ছিলেন ভিতরে ভিতরে বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং তাঁদের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। দুজনেরই রাজনীতি কংগ্রেস উচ্চকোটির চালিত রাজনীতির বিপক্ষে ছিল—শরৎচন্দ্র এই মতভেদের ক্ষেত্রে একান্তভাবেই চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের ভাগ্যের সঙ্গে স্বীয় ভাগ্যকে যুক্ত করেছিলেন।) চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন, তেমনি দুইয়ের প্রতি শরৎচন্দ্রেরও প্রাণের টান ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক ছিল শ্রদ্ধার ও সৌখ্যের, আর অগ্রজত্বের কারণে সুভাষচন্দ্রের প্রতি বরাবর অকৃত্রিম স্নেহপাশে বদ্ধ ছিলেন শরৎচন্দ্র। দেশবন্ধুকে তিনি কী দৃষ্টিতে দেখতেন তার পরিচয় আছে তাঁর দেশবন্ধুর তিরোধানের পর লিখিত 'স্মৃতিকথা' প্রবন্ধটিতে, যা ১৩৩২ আষাঢ় দেশবন্ধু স্মৃতিসংখ্যা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল ও পরে তাঁর স্বদেশ ও সাহিত্য গ্রন্থে সংকলিত হয়। সুভাষচন্দ্রের উপরে অবশ্য শরৎচন্দ্রের আলাদা কোন নিবন্ধ নেই, তবে তরুণের বিদ্রোহ গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধাবলীতে শরৎচন্দ্র যে মতাদর্শের প্রচার করেছেন তার মধ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্রের পরিপোষিত তরুণের স্বপ্নকেই সমর্থন দান করা হয়েছে বলে মনে করতে পারা যায়। সুভাষচন্দ্র অবশ্য ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা ভারতবর্ষের এক প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের ঐকান্তিক স্বদেশপ্রেমের উল্লেখ করে বাংলার এই চিত্তজয়ী লেখকের প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

(মহাত্মাজীর রাজনৈতিক মত ও পথ শরৎচন্দ্র কখনোই প্রাণের থেকে সমর্থন করতে পারেননি, বিশেষতঃ গান্ধীজীর চরকা-নীতির তিনি একজন ঘোরতর সমালোচক ছিলেন। তাহলেও ব্যক্তিগত স্তরে তিনি গান্ধীজীকে যে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন তার পরিচয় রয়েছে তাঁর 'মহাত্মাজী' নামক প্রবন্ধটিতে (নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২৯, স্বদেশ ও সাহিত্য গ্রন্থে সংকলিত)। এই প্রবন্ধে মহাত্মাজীর নির্ভীকতা ও সত্যনিষ্ঠাকে তিনি সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন।) যখন সমগ্র দেশ চৌরীচৌরার কারণে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে গান্ধীজীর কঠোর সমালোচনায় রত তখন গান্ধীজীর কর্মপন্থার সমর্থক না হয়েও শুধু তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্য শরৎচন্দ্র তাঁকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

যিনি সুভাষচন্দ্রের নীতির সমর্থক তিনি একই সঙ্গে কেমন করে মহাত্মাজীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন? এই সমন্বয় কি আসলে স্ববিরোধিতা নয়? এইখানেই চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রের একটি বৃহৎ ধাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। দেখা যায় যে, বৃহৎ ও মহৎ মানুষদের সকলেরই মধ্যে এমন কিছু বিরল গুণ থাকে যা মতবাদ-নিরপেক্ষ এবং যেগুলিকে মতবৈষম্যের সীমারেখা অতিক্রম করে সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরুদ্ধ শিবিরে অবস্থান করতেও দেখা যায়। এই সব বিরল গুণের কাছে সকলেই মাথা নোয়াতে বাধ্য। যেমন সত্যনিষ্ঠা, শৌর্যবীর্য, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, সৎসাহস, আন্তরিকতা ইত্যাদি। এই সব গুণের ক্ষেত্রে মহৎ মানুষেরা তাঁদের ব্যক্তিত্বের ভেদ আর মতামতের ভেদ সমেত অস্তিত্বের সমভূমিতে বিরাজ করেন। আর সেই কারণেই দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ মতের প্রবক্তাকে একই কালে শ্রদ্ধা জানাতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, যদি তাঁদের মধ্যে কীর্তনীয় একাধিক গুণের সমাবেশ হয়। এই দৃষ্টিতে দেখলে একই কালে গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানানো কেন সম্ভব বুঝতে কষ্ট হয় না এবং সমন্বয়ের তত্ত্বটিও অনুধাবন করা সহজ হয়।

যাই হোক, তারুণ্যের আদর্শটিকে শরৎচন্দ্র কেমনভাবে দেখেছেন, তাঁর তরুণের বিদ্রোহ (১৯২৯) বইটিকে কেন্দ্র করে তার উপর এক-নজর চোখ বুলনো যাক। প্রথমেই তরুণ সমাজের রাজনীতির সংস্রবে থাকার ঔচিত্য তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। তরুণের জাগরণকে তিনি দেশের রাজনীতির পক্ষে অপরিহার্য জ্ঞান করেছেন। আর শুধু রাজনীতি কেন, সমাজনীতি অর্থনীতি সর্ববিধ নীতির ক্ষেত্রেই তিনি তরুণ-শক্তির উদ্বোধন কামনা করেছেন। এটি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, স্থবিরত্বের উপরে তারুণ্যের, প্রাবীণ্যের উপরে নবীনের বিজয়-কেতন ওড়ানোর অভ্রান্ত সংকেত। স্বাধীনতার প্রকৃতি নির্দেশ করতে গিয়ে নবীনের পূজারী শরৎচন্দ্র বলছেন—'কিন্তু স্বাধীনতা শুধু কেবল একটা নাম মাত্রই ত নয়। দাতার দক্ষিণ হস্তের দানেই ত একে ভিক্ষার মত পাওয়া যায় না—এর মূল্য দিতে হয়। কিন্তু কোথায় মূল্য? কার কাছে আছে? আছে শুধু যৌবনের রক্তের মধ্যে সঞ্চিত। সে অর্গল যতদিন না মুক্ত হবে, কোথাও এর সন্ধান মিলবে না। সেই অর্গল মুক্ত করার দিন এসেছে। কোনক্রমেই আর বিলম্ব করা চলে না।'

বিপ্লবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে পথের দাবী উপন্যাসের একাধিক স্থলে আলোচনা আছে। সেখানে সব্যসাচী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, বিপ্লব মানেই

রক্তারক্তি কাণ্ড নয়, বিপ্লব মানে একটা দ্রুত আমূল পরিবর্তন। তরুণের বিদ্রোহ বইতেও অনুরূপ ভাবের কথা আছে। অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের নিষ্ফলতার উল্লেখ করে তার বিরুদ্ধে তরুণ সমাজকে সতর্ক করে দিয়ে শরৎ-চন্দ্র বলেছেন—'বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য ধরে তার প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব-পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে। নইলে অসহিষ্ণু অভিলাষ ও কল্পনার আতিশয্য তোমাদের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই দেবে না।'

পুরাতনপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে শরৎচন্দ্র বলছেন—'একটা কথা পুরোনোপন্থীদের মুখে দুঃখ করে প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে, সেকালে এমনটি ছিল না। এখন চাষারা পর্যন্ত জামা পরে, পায়ে জুতো দিতে চায়, মাথায় ছাতা ধরে, তাদের মেয়েরা গায়ে সাবান মাখে, বাবুয়ানিতে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। প্রত্যুত্তরে তাদের এই কথাই তোমাদের বলা চাই যে, এই যদি সত্য হয় তো আনন্দের কথা। দেশ উচ্ছন্নে না গিয়ে উন্নতির দিকে মুখ ফিরিয়েছে, তারই আভাস দেখা দিয়েছে। মানুষ যত চায়, ততই তার পাবার শক্তি বাড়ে। অভাব জয় করাই জীবনের সফলতা—তাকে স্বীকার করে তার গোলামী করাটাই কাপুরুষতা। একদিন যা ছিল না, তাকে অহেতুক বাবুয়ানি বলে ধিক্কার দিয়ে বেড়ানোই দেশের কল্যাণ কামনা নয়।'

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি দেবার প্রয়োজন অনুভব করেছি এই কারণে যে, এক-কালের বঞ্চিতরা কিছু একটা ভোগের উপকরণ সংগ্রহের সামর্থ্য অর্জন করলেই তাকে বিলাসিতা আর ছোটলোকের বেয়াদপি বলে চালাবার যে-মধ্যবিত্ত মানসিকতা আজও আমাদের মধ্যে ঘাপটি গেড়ে রয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে এই বক্তব্যে। এই প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল। অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করাটাই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা নয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তরুণের বিদ্রোহ বইয়ের বাইরেও রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রবন্ধ-নিবন্ধ আছে। 'সত্যাশ্রয়ী' এইরূপ একটি প্রবন্ধ। এতে লেখক যৌবনের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এইভাবে—'অতীত যার কাছে অতীতের বেশী নয়, সে যত বৃহৎ হোক, মুগ্ধ-চিত্ত-তলে তাকেই লালন করে

কালক্ষেপের অবসর যার নেই, যার বৃহত্তর আশা ও বিশ্বাস অনাগতের অন্তরালের কল্পনায় উদ্ভাসিত—সেই তো যৌবন।'

সত্যের প্রকৃত স্বরূপ কী? এই প্রশ্নে জ্ঞানী ও ভাবুকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন সত্য অপরিবর্তনীয় ধ্রুব। কতকগুলি সত্য আছে, যার কখনও কোন নড়চড় হয় না। শরৎচন্দ্র এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একমত নন। তাঁর কথা হলো—'সত্যের কোন শাশ্বত সংজ্ঞা আমার জানা নেই। দেশ, কাল বা পাত্রের যে সম্বন্ধ বা relation তা দিয়েই সত্যের যাচাই হয়। দেশ-কাল-পাত্রের পরস্পরের সম্বন্ধের সত্যজ্ঞানই সত্যের স্বরূপ। একের পরিবর্তনের সঙ্গে অপরের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তনকে বুদ্ধিপূর্বক মেনে নেওয়াই সত্যকে জানা।'

শরৎচন্দ্রের এই বক্তব্যের সঙ্গে আজকের প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এতে তাঁর অগ্রসরমুখী মনেরই শুধু পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিশিষ্ট ঃ শরৎচন্দ্রের আত্মকথা

"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। পরে পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেননি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে, সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখন স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যাননি, এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে, ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে সুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প-রচনা অকেজোর কাজ মনে করে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তারপর অনেক বৎসর চলে গেল। আমি যে কোন কালে একটি লাইন লিখেছি, সে-কথা ভুলে গেলাম।

আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিক পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিম্‌রাজী হয়েছিলাম: কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আমি লেখা দিতেও স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, কোন রকমে একবার রেঙ্গুন পৌঁছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য সত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত 'যমুনা'র জন্য একটি ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাঙলার পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম। তারপর আমি অদ্যাবধি নিয়মিত ভাবে লিখে আসছি। বাঙলাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান্ লেখক যাকে কোনদিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়নি।"*

---

* বাতায়ন, শরৎ স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৪৪